

বিমান নিয়ে কথা

কান্তা জেসমিন

বিমান নিয়ে কথা

কান্তা জেসমিন

শাওন প্রকাশনী

প্রকাশনায়.
শাওন ইয়াসমিন
শাওন প্রকাশনী
বাড়ি ৩, রোড ৫, ব্লক এ, সেকশন ১১
মিরপুর, ঢাকা
বাংলাদেশ
E-mail: mmahmud@bangla.net

প্রথম প্রকাশ.
২০০৫

© লেখক

প্রচ্ছদ.
মসিউজামান মাহমুদ

ISBN 984 32 1816 7

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ
গ্রোব প্রিন্টার্স লিঃ
১৯ শেখ সাহেব বাজার, আজিমপুর, ঢাকা

মূল্য: একশত পঞ্চাশ টাকা

আমার দাদা ও দাদী

মহিউদ্দীন আহমদ
আমীরন বেগম

কৈশোরে তাঁদের সমাধির
সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম
মনে পড়ে

BIMAN NYEA KATHA (All about Aeroplane) by Kanta Jasmine,
Published in 2005, by Shaon Prakashoni, House 3, Road 5, Block A,
Section 11, Mirpur, Dhaka, Bangladesh. Price: Taka one hundred and fifty
only. \$ 10

সূচিপত্র.

প্রথম অধ্যায়: প্লেন ক্র্যাশ	৫
দ্বিতীয় অধ্যায়: বিমান দুর্ঘটনার গোপনীয়তা প্রকাশ	১৯
তৃতীয় অধ্যায়: অন্তর্ধাত	২৯
চতুর্থ অধ্যায়: বিমান ছিনতাই	৩৭
পঞ্চম অধ্যায়: বিচিত্র কিছু	৪৫

প্লেন ক্র্যাশ

১.

তারিখটা ১৯৪৩ সালের ২৫শে জুন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। গভীর রাতে দুঃস্মিন্দ দেখে ঘুম ভেঙে গেল জোসে হলগুইন এর মায়ের, দেখলেন, তাঁর ছেলের বি-১৭ বোম্বার অন্ধকার আকাশ পথে ছুটে চলেছে। হঠাৎ মরণ আঘাত হানল জাপানী বিমান বিঘ্রংসী গোলা, আগুনের বাঁটা দেখা দিল বিমানের পেছনে। বাঁটার বাহক পাক খেতে খেতে এসে আঘাত হানল ভূমিতে, সাথে সাথে এক বিরাট বিক্ষেপণ।

ক'দিন পরে মায়ের হাতে এসে পৌছল টেলিগ্রাম, ২৫শে জুন রাতে এক সামরিক অভিযানের পর থেকে জোসেকে ‘মিসিং ইন অ্যাকশন’ ঘোষণা করা হয়েছে। টেলিগ্রাম হাতে পেয়েও মায়ের মন বলল তাঁর সন্তান মরেনি, সে এখনও রেঁচে আছে। প্রতিদিন সকালে কাজে যাবার পথে চার্চে ক্রশের সামনে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করে যান সন্তানের মঙ্গলের উদ্দেশ্য। কে এই জোসে হলগুইন? প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল তাঁর জীবনে সে রাতে?

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস, যুক্তরাষ্ট্রে হাই স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশনের পর জোসে ‘জে’ হলগুইন সামরিক বাহিনীর এয়ার কোর বিভাগে যোগদান করে। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শেষে তাদের নয় জনকে নিয়োগ করা হল একটা বি-১৭ বোম্বারের দায়িত্বে। নিউগিনির পোর্ট মোরেসরিতে ৬৫তম ক্ষোয়াড্জনের ৪৩তম বোমারং দু'দলের অধীনে ছিল তাদের ছোট দলটা। আদর করে সেই বি-১৭ বাহনের নাম রাখল তারা ‘নটি বাট নাইস’ (Naughty but nice), আর তার নাকের পাশে ঝঁকে দিল এক হাসিখুশি ত্রুটে কন্যাকে।

‘নটি বাট নাইস’ এর জুন্ডের মাঝে নেভিগেটর জো, বোমারং ফ্র্যাঙ্ক পেটি আর গোলা নিয়ন্ত্রক বা গানার হেনরী গার্সিয়া, এই তিনজন ছিল বিশেষভাবে একাটা। জো এর মতো ২৯ বছর বয়স্ক হেনরী গার্সিয়াও ছিল হিসপ্যানিক। যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য সে

বিমান নিয়ে কথা

কিছুটা মিথ্যার আশ্রয় নেয়, বিবাহিত এবং চার সন্তানের জনক হওয়া সত্ত্বেও রিভুটিং এর সময় নিজের বয়স কিছুটা কমিয়ে দেয় সে, আর তার ওপর নির্ভরশীল পরিবারটির কথা চেপে যায় সম্পূর্ণই।

ঘটনার শুরু ১৯৪৩ এর ২৫শে জুন, গভীর রাতে। একজন অতিরিক্ত যাত্রীসহ মোট দশজনকে নিয়ে 'নটি বাট নাইস' উড়াল দিল আকাশে, গন্তব্য চারশ' মাইল দূরে জাপানী সেনা অধিকৃত নিউ ব্রিটেন দ্বীপের 'রাবাউল' নামক স্থান, উদ্দেশ্য 'ভূনাকানাউ' বিমানঘাটিতে অবস্থিত চক্রশক্তির রসদের স্তুপ আর ফাইটার বিমানগুলোকে ধ্বংস করা। সেটা ছিল লেফ্টেন্যান্ট হলগুইন এর চল্লিশতম অভিযান।

উর্ধ্বাকাশে বিমানের পেট থেকে যখন এক এক করে বোমা খসে পড়ছে রাবাউলের ওপর, হঠাৎই 'নটি বাট নাইস' ধ্বনি পড়ে গেল বিমান বিধ্বংসী কামানের সার্ট লাইটের কাছে। মৃহর্তরের মাঝে তাকে লক্ষ্য করে ভূমি থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে এল গোলা, তিন নম্বর ইঞ্জিনটাতে দেখা দিল আগনের লেলিহান শিখা। একই সাথে বিনা নোটিশে সেখানে উপস্থিত হল এক জাপানী নাইট ফাইটার। ওটার ছোড়া ২০ মি.মি. শেল 'নটি বাট নাইস'কে একেবারে ঝাঁকারা করে দিল। কন্ট্রোল প্যানেলের ওপরে কোপাইলট ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে, বিক্ষিণ্ণ শেলের একটা টুকরা ছিটকে এসে আশ্রয় নিল জো'র থুতনীতে, আর একটা বুলেট তার বাম পাঁটাকে করে দিল এফোড় ওফোড়।

বিমানের নাক তখন ঘুরে গেছে মাটির দিকে। তাড়াতাড়ি কাঁধে প্যারাস্যুট চাপিয়ে জো 'এমার্জেন্সী এক্সিট' খুলে ফেলল। ওদিকে ফ্র্যাঙ্ক তখন আরেকটা প্যারাস্যুট নিয়ে টানাটানি করছে। জো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেই ফ্র্যাঙ্ক চ্যাচাল,

- আমার জন্য দেরী কোরোনা, জো! এখনুন লাফ দাও!

বিমানের একটা ঘূর্ণিপাকের ফলে জো ছিটকে বেরিয়ে গেল খোলা হ্যাচ দিয়ে, নিজের গতিপথের ওপর তখন আর কেন নিয়ন্ত্রণ নেই তার। 'প্যারাস্যুটে কয়েকশ' ফুট পড়তে পায়ে ঠেকল গাছের ডালপালা। সেই ডালপালা ভেঙে মাটিতে পড়তে নিজের অজান্তে গলা চিরে আর্টনাদ উঠল তার,

- মা-আ-আ-আ...। পতনের স্থান থেকে মাত্র দু'শ ফুট দূরে এক পাহাড় সারির মাঝে অর্ধভূঁ 'নটি বাট নাইস' তখন জুলছে দাউ দাউ করে।

আগনের তেজ কমে এল ধীরে ধীরে, সেদিকে চেয়ে থেকে ক্লান্ত জো'র দু'চোখে নেমে এল রাজ্যের ঘূম। রাত পেরিয়ে ভোর হল একসময়, ধ্বংসস্তুপের মাঝে জেগে উঠল জো, আহত অভূত আর ছিন্নবন্ধে। গাছ থেকে বেছে বেছে দু'টো ডাল ভেঙে নিয়ে লাঠির মত তৈরি করল, তারপর শুধুমাত্র মনের জোরে তাতে তর দিয়ে যন্ত্রণাকাতর পাঁটা টেনে নিয়ে চলল বিমানের ধ্বংসস্তুপটার দিকে। জীবনের কোন চিহ্নই নেই সেখানে।

বিমান নিয়ে কথা

বাঁ পায়ের জুতাটা কখন খসে পড়েছে লক্ষ্য করেনি জো, মৃত টেইল গানারের পা থেকে জুতাটা খুলে নিয়ে সে প্রয়োজন মেটাল। কিছুটা সামনে আরেক গানারের মৃতদেহ উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, চেহারাটা দেখা যাচ্ছে না, হাতের অনামিকায় আংটি, তাতে দু'টি অক্ষর খোদাই করা, এইচ. জি. -হেনরী গার্সিয়া। জলে তরে এল দু'চোখ, দৃষ্টিপথ বাপসা হল জো'র। মনে পড়ল রিভুটিং এর সময় তাকে বলা হেনরীর কথাগুলো,

- দেশের প্রতি আমার একটা ঝণ আছে, দায়িত্ব আছে। এ ঝণ শোধের এমন সুযোগ আমি আর কোনভাবে পেতাম না।

হাঁটু হেঢ়ে মৃতদেহটির পাশে বসে পড়ল জো,

- যদি কখনও এখান থেকে বের হতে পারি, প্রতিজ্ঞা করল সে, শপথ করে বলছি আবার ফিরে আসব। তোমাদের মরদেহ পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে তবেই এ শপথ পূরণ হবে, তবেই আমার শাস্তি।

মৃতদের আস্থার শাস্তির জন্য প্রার্থনা করল জো। ধ্বংসস্তুপের মাঝে উঁকি দিতে তৃতীয় গানারের মৃতদেহ দেখা গেল, কিন্তু দেহে আর শক্তি নেই, পাহাড়ের খাঁজটা পার হয়ে বাদবাকিটুকু খুঁজে দেখা আর দৈর্ঘ্যে কুলাল না।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে প্রায় গড়াতে গড়াতে অবশ্যে একটা বারণার পাশে এসে থামল জো। বারণা ধরে চলতে থাকলে একসময় না একসময় সমুদ্র উপকূলে গিয়ে পৌছবে, এই আশায় বুক বেঁধে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁচড়ে পাচড়ে চলতে লাগল সে। বারণার পানি, কাঁচা ব্যাঙ আর পোকামাকড় এগুলোই হল ক্ষুধার জুলা মেটানোর একমাত্র সহায়। তার ওপরে রাতের বেলা ঘুমের মধ্যে রয়েছে পোকামাকড় আর দুঃস্বপ্নের উৎপাত।

এমনিভাবে ২৭ দিন পথ চলে মৃত্যুর খুব কাছাকাছি পৌছে গেল জো। তার পাশে পাশেই ঝোপঝাড়ের আড়ালে মৃত্যুর হিমশীতল পদচারণা, দিনের বেলা পাতার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য রাখে, আর রাতের আঁধারে দুঃস্বপ্নের মাঝে টুটি টিপে ধরতে চায়।

- কেন এমন লুকোচুরি? দেশে ফেরা দূরে থাক, জীবনে এ জঙ্গল থেকেই কি আর বের হতে পারব? কেন খামোখা এ দুঃসহ যন্ত্রনা বয়ে বেড়ান!

জো'র বিক্ষিণ্ণ মনের নির্দেশে অবধারিতভাবেই ০.৪৫-এ বুলেট ভরল সে, তারপর চেপে ধরল অন্ত্রের শীতল নলটা কপালের পাশে....। হঠাৎ ঘোরের মাঝে যেন দাদীমা'র স্নেহমাখা কঠিন্বর শুনতে পেল সে,

- বাছা, অন্ত্রটা যদি ব্যবহার কর, তবে দোজখে যাবে। ঈশ্বর আঞ্চল্যে পছন্দ করে না, ওটা সরিয়ে রাখ।

মেনে নিল জো সেই অমোয নির্দেশকে, শরীর ভেঙে সেখানেই বসে পড়ল, একসময় খিমুনি এসে গেল তার। কতক্ষণ পরে জানে না, চোখ যখন খুলল, চোখাচোখি হল একদল স্থানীয় লোকের সাথে।

ঐ স্থানীয় লোকেরা আহত জো'কে বহন করে নিয়ে গেল তাদের ঘামে। সেখানে খাওয়া ও বিশ্রামের পর পাঠিয়ে দিল ভিন্ন গ্রামে, চিকিৎসার জন্য। এর কিছুদিন পরে জো ধরা পড়ল জাপানী সৈন্যদের হাতে, রাবাউলের এক যুদ্ধবন্দী শিবিরে নিয়ে যাওয়া হল তাকে। ১৯৪৫ এর আগস্টে যুদ্ধ শেষ হবার আগ পর্যন্ত অন্যান্য বন্দী বৈমানিকদের সাথে সে সেখানেই ছিল।

ভি.জি দিবসের (V.J. Days) কিছুদিন পরে জোর শ্রী রেবেকা একটা চিঠি পেল ফ্রাঙ্ক পেটি'র শ্রী হেলেনের কাছ থেকে। চিঠির সাথে ছিল একটা পেপার কাটিং রাবাউলের বন্দী শিবিরে শেষ পর্যন্ত যেসব বন্দীরা টিকে ছিল, তাদের নামধার। জো'র নাম তাতে আছে, ফ্রাঙ্কেরটা নেই।

দেশে ফিরে কয়েক সপ্তাহ হাসপাতালে কাটাবার পর ৯০ দিনের এক লম্বা ছুটিতে জো তার নয়জন সহযোগী এবং রাবাউলে যেসব বন্দী মারা গিয়েছিল তাদের প্রত্যেকের আঞ্চায় ব্রজনের সাথে দেখা করে। প্রতিজ্ঞাপূরণের জন্য অকৃত্তলে সে ফিরে যেতে পারেনি, সক্রিয় দায়িত্ব থাকায়। সেনাবাহিনী থেকে তাকে সে আশ্বাস দেয়া হলেও তারা কোন উপযুক্ত অগ্রগতি দেখাতে পারেনি।

১৯৬৩ সালে জো অবসর গ্রহণ করল সক্রিয় দায়িত্ব থেকে। বিভিন্ন ডিগ্রীধারী হওয়ায় সহজেই এক হাইস্কুল নিয়ে নিল তাকে সহকারী প্রিসিপ্যাল হিসেবে। ১৯৮১তে এসে এর পাশাপাশি সামরিক পেনসনে তার তখন বেশ সচ্ছল অবস্থা। ইতিমধ্যে 'নটি বাট নাইস' এর বাদবাকি ক্রু'দের ভাগ্য সম্পর্কে সামান্য কোন খবরও পাওয়া যায়নি। জো তখন ঘাট বছরের প্রীতি, চার সপ্তাহের জনক। শপথের কথা সে এখনও ভোলেনি, সচ্ছল নির্বাঙ্গুট জীবনে তা একটা অশাস্ত্রির মতো বিরাজ করছে।

অবশ্যে একদিন শ্রী রেবেকা'কে সে বলল, আমাকে ফিরে যেতেই হবে।

প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে সেই নির্জন রাবাউলে যেতে জো'র এক সপ্তাহ লাগল, আর লাগল সামরিক পাসপোর্ট। পুরানা মানচিত্র হেঁটে, গাড়িভাড়া করে যে গ্রামে সে জাপানীদের হাতে ধরা পড়েছিল, তার খোঁজ করল। কিন্তু হা হতোঁখি! ছুটি ফুরিয়ে আসতে বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরে এল, কোন ফলাফল ছাড়াই।

এক বছর পরের কথা, নিউ ব্রিটেনে দু'জন অ্ব্রেলিয়ানের সাথে পরিচয় হল তার, জো'র অভিযানের কথা শুনে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করল তার। তাদের সহ এবারে হেলিকপ্টারে চড়ে ফিরে চলল সে রাবাউলে। মানচিত্রে বিমান ক্র্যাশের একটা সংজ্ঞায় জায়গা চিহ্নিত করে সেখানেই নামা হল। তিনজন মিলে পায়ে হেঁটে একটা ঝরণার ধার দিয়ে এগিয়ে চলল তার উৎসমুখের দিকে।

একটা বাঁক ঘূরতেই জো'র বুক ধ্বক করে উঠল, এই জায়গাটাই! তার মন বলছে এটাই সেই অকৃত্তল! তিনজনে মিলে জায়গাটাকে কেন্দ্র করে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল, সামান্য খুঁজতে পাওয়া গেল বি-১৭ কে, এক বাড়ি বোপ জপলের তলায়। তার নাকের পাশে লেখাটা এখনও পড়া যাচ্ছে- 'নটি বাট নাইস' লেখার পাশে হাসিখুশি সেই ক্রন্টে কল্য। জো'র দু'চোখ ফেটে জল এল।

বিমানের ধ্বনিশব্দে পেলেও ক্রু'দের কোন দেহাবশেষ বা চিহ্ন তারা খুঁজে পেল না, ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল রাবাউল শহরে। নিউ ব্রিটেন কর্তৃপক্ষের কানে সংবাদটা পৌছতে তারা পুরানা নথিপত্র ঘাঁটতে জো'কে উৎসাহ দিল। খুঁজতে গিয়ে আঠালো হলদে কাগজে পূর্ণ পুরানো এক বাক্স থেকে বের হল ১৯৪৯ সালে আমেরিকান এভ রেজিস্ট্রেশন সার্ভিসের কাগজ। সে কাগজের সারমর্ম, মানচিত্র তৈরীর একটি দল স্থানীয় লোকদের সাহায্যে জরীপ চালাতে গিয়ে একটি ভাঙ্গা বি- ১৭ বিমানের দেখা পায়। যে স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে, তা জো'র মানচিত্রে চিহ্নিত স্থানটির সাথে অনেকখানি মিলে যায়। রিপোর্টে বলা হয়, তিনি ব্যক্তির আংশিক দেহাবশেষ একটা অগভীর কবরে পাওয়া গিয়েছিল। অন্য কোন সনাত্ককারী চিহ্ন কোথাও পাওয়া যায়নি, একমাত্র 'এইচ. জি.' খোদিত একটি আংটি ছাড়া। দেহাবশেষগুলো হাওয়াইতে বিমানযোগে পাঠিয়ে দেয়া হয় ল্যাবরেটরী আইডেন্টিফিকেশনের জন্য। কিন্তু এতে কোন কাজ না হলে তা সেখানকার জাতীয় সামরিক কবরস্থানে 'অজ্ঞাত' হিসেবে কবর দেয়া হয়।

দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, বামেলা আর দুশ্চিন্তার পর অবশেষে জো একটু আশার আলো দেখতে পেল। কিন্তু বাড়ি ফিরে চিঠির মাধ্যমে আর টেলিফনে হাওয়াইতে যোগাযোগ করলে সেখান থেকে তেমন কোন সাড়া মিলল না। তার ওপরে দেখা দিল নতুন একটা বিভ্রান্তি। যদিও মানচিত্র তৈরির দলটি তিনটি দেহাবশেষ পেয়েছে বলে জানিয়েছিল, কিন্তু হাওয়াইতে দাফনকারীরা দেহাবশেষগুলো চারজনের হিসেবে ভাগ করে দাফন করে।

১৯৮৩'র শীঘ্ৰে সেই অ্ব্রেলিয়ান বন্ধু দু'জন অকৃত্তলের আশেপাশে ২০০ গজের মত এলাকা চমে ফেলে, কিন্তু আবারও ব্যর্থতা। দেশে ফিরে আসে একমাত্র সান্ত্বনা নিয়ে, ওখানে খুঁজে পাবার মত অবশিষ্ট কিছু নেই।

সামরিক গোরস্থান আর পেন্টাগনের অফিসে ক্রমাগত চিঠি লিখে চলল জো। তার তাগাদায় অবশ্যে এ১৯৮৪'র আগস্টে 'নটি বাট নাইস' এর ক্রু'দের মেডিকেল ও ডেন্টাল রিপোর্ট চেয়ে পাঠাল আর্মি। এক প্রজন্য আগেও যেসব জটিল আর উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ও প্রক্রিয়া ছিল না, তার সাহায্যেই আর্মির ন্তৃত্ববিদেরা পাঁচ ব্যক্তির দেহাবশেষ সনাক্ত করতে সমর্থ হল। তারা হল সার্জেন্ট হেনরী পার্সিয়া, লেফটেন্যান্ট ফ্রান্সিস পেটি, সার্জেন্ট রবার্ট গ্রিয়াবেল, লেফটেন্যান্ট হারম্যান নট। এবং সার্জেন্ট পেস পেইন।

বিমান নিয়ে কথা

জো'র সহায়তায় আর্ম'র দুর্ঘটনা ও শৃঙ্খলক্ষণ বিভাগ নিহতদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করল। ১৯৮৫ সালের প্রথম দিকে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় সেই পাঁচজনের প্রত্যেকের সমাহিত করার অনুষ্ঠান পালিত হয়। জো প্রতিটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নিহতের প্রতিনিধিকে নিহতের প্রাপ্য সম্মানের সামরিক পদক পরিয়ে দেয়।

নিজ তহবিল থেকে দেয়া ১৫ হাজার ডলার ব্যয়ে জো হলগুইনের এই অভিযান তার স্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কারণ, চারজন ক্রু তখনও নিষ্ঠোজ, তাদের সমান্যতম চিহ্নও সে পায়নি কোথাও, না মৃত, না জীবিত। তবু সে হাল ছেড়ে দেয়নি, কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস, এই অভিযান সম্পূর্ণ করার জন্যই সেদিন রাবাউলের দুর্ঘটনার পরে প্রাণ নিয়ে সে দেশে ফিরতে পেরেছিল।

২.

জোসে হলগুইনের প্রায় সমসাময়িক আরেকজন বৈমানিক যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ স্মিথ, কিন্তু বিমান দুর্ঘটনায় তার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের।

অভিজ্ঞতার শুরু ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের এক রোদ্রেজ্জল দিনে। স্মিথের সেদিন ছুটি, এয়ারপোর্টে থাকার কথা নয় তবে সেখানে গেছে রিপোর্ট করতে, আগের দিন একটা নতুন বিমানের টেস্ট ফ্লাইট ছিল। রিপোর্টিং শেষে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কক্ষ থেকে বের হয়ে আসছিল সে, মুহূর্তে দৃষ্টি অটকাল হ্যাঙ্গারে রাখা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটা বিমানে, বিমানটি ছিল স্কাইরকেট (Sky-rocket) জাতীয়, শব্দের সমান গতিতে তা উড়তে পারে। শব্দের বেগ ঘন্টায় ৭৬০ মাইল, আর স্কাইরকেট জাতীয় বিমানে সহজেই ঘন্টায় ৭৭০-৭৮০ মাইল বেগ তোলা সম্ভব।

আগের দিনই স্মিথ নতুন ধরনের একটা বিমান চালিয়েছে, কিন্তু স্কাইরকেটের সাক্ষাৎ তার এই প্রথম, বিমানটির চারপাশে তাকে ঘুরতে দেখে টেস্ট ফ্লাইটের পরিচালক এগিয়ে এল,

- আরে স্মিথ যে, তা এই ছুটির দিনে ? ব্যাপার কি?
- এই একটা রিপোর্টিং এর কাজ ছিল। তা, এটাই স্কাইরকেট, না?
- হ্যাঁ, জাত বৈমানিক স্মিথের আগ্রহ বুঝে সে প্রস্তাব দিল, যাহোক, এসেই যখন গিয়েছ, তখন এটার একটু টেস্ট ফ্লাইট করে দাও না!

স্মিথ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। সামান্য সময়ের ব্যাপার ভেবে পোষাক পরিবর্তন না করেই স্কাইরকেটে চাপল সে, অঞ্জিজেন মাঝ, ব্যাম্প এগুলোর মত অতি দরকারী জিনিষগুলো শুধু সাথে রাইল। ক'মিনিট পরে তাকে দেখা গেল উর্ধ্বাকাশে, মহাসাগরের ওপর দিয়ে তার স্কাইরকেট ছুটে চলেছে তীরের বেগে। সে মুহূর্তে

বিমান নিয়ে কথা

আকাশে আরও দু'টি মার্কিন বিমান উড়ছিল, তাদের সামনে স্মিথের বিমানটি ছুট করে ৩,৭০০ ফুট উচুতে উঠে গেল, বায়ুমণ্ডল চিরে তা ছুটে চলল ৭৭০ মাইল/ঘন্টা বেগে।

ভৃপৃষ্ঠের সমাত্তরালে ধাবমান বিমানটির টেস্ট ফ্লাইট ঠিকমতোই চলছিল, কিন্তু গোলমাল শুরু হল তাকে সর্বোচ্চ গতিবেগে নিতে যাবার সময়। স্মিথ হঠাৎ লক্ষ্য করল স্পিডোমিটারে কাঁটা আর তার নিয়ন্ত্রণে নেই। এর পর ঘটনা ঘটতে লাগল খুব দ্রুত। বিমানের দেহ বাঁকি থেকে থেকে নিম্নমূর্তী হল, এভাবে চললে তার গন্তব্যস্থল হবে মহাসাগরের নীল জলরাশি, এই ৭৭৭ মাইল/ঘন্টা বেগে নীচের দিকে ছুটে চলা স্কাইরকেট তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে, এটাকে সে থামাবে কিভাবে!

কক্ষগিটে বসে ঘামতে ঘামতে চারিদিকে সহায়ের আবেদন পাঠাল স্মিথ, সে আবেদন ধরা পড়ল নীচে উড়ভায়মান বৈমানিক কিংকেলা'র বেতারে। বিমান ছাড় স্মিথ, এখনি প্যারাস্যুট নিয়ে লাফ দাও, কিংকেলার এ নির্দেশের কি জবাব এল তা পরিষ্কার বোঝা গেল না। স্মিথের জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েও অনেকটা ঘোরের মাধ্যেই বার্তা পাঠাতে থাকল কিংকেলা,

- স্মিথ! প্রাণের মায়া থাকে তো বিমান ছাড়! লাফ দাও, তুমি লাফ দাও...

সঞ্চাব্য মৃত্যুর আশংকায় মরিয়া হয়ে কক্ষগিটে বসে থাকা স্মিথ দুঃসাহসী এক সিন্দ্রাত নিয়ে ফেলল। বিমানে আর এক মুহূর্ত থাকা মানে নিশ্চিত মৃত্যু, আর ৭৭৭ মাইল/ঘন্টা বেগে নীচের দিকে ধাবমান এই বিমান থেকে লাফিয়ে পড়লে নিহত হবার সম্ভাবনা শতকরা ১৯ ভাগ। বাঁকি একভাগ বাঁচার সম্ভাবনাকেই সে মরিয়া হয়ে আঁকড়ে ধরল। 'যা থাকে কপালে' চিন্তা করে আসনের পাশে একটা বোতাম টিপে দিল সে। সাথে সাথে পাইলটের আসন স্মিথকে সহ বিমান থেকে ছিটকে বের হয়ে এল। বিমান তখন ভৃপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬,৫০০ ফুট উঁচুতে।

স্বয়ংক্রিয় প্যারাস্যুট নির্দেশ মোতাবেক খুলে গেল ঠিকই, কিন্তু ঐ উচ্চতায় বাতাসের প্রচও ঝাপটা সহ্য করতে পারল না, তার এক ত্বরীয়াংশ ছিঁড়ে উড়ে গেল। বাতাসের কারসাজি স্মিথকেও রেহাই দিল না। তীব্র বিপরীতমুর্তী বাতাস তার হেলমেট ও অঞ্জিজেন মুখোশ উড়িয়ে নিল এক মুহূর্তের মধ্যে। অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় সাথে সাথে স্মিথ জ্বান হারাল। ঠোঁট থেকে নাকের প্রান্তের ওপর পর্যন্ত ছিঁড়ে পড়ল, চোখের মনি ঠেলে বের হয়ে আসতে চাইল কোটির থেকে। বিপরীতমুর্তী বায়ু কঠনালী দিয়ে ঢুকে পাকস্থলীকে ফুলিয়ে ফেলল বেলুনের মত, সারাদেহ অবশ হয়ে পড়ল মৃত্যু যন্ত্রণায়।

ওদিকে বিমান থেকে স্মিথ বের হবার প্রায় সাথে সাথে তা প্রচও শব্দে বিস্ফোরিত হয়েছে। এ ধরনের দুর্ঘটনা ইতিহাসে বিরল না হলেও পূর্বে মাত্র দু'জন বৈমানিক এমন অভিজ্ঞতার পর টিকে ছিল, জন স্ট্যাপ ও হেনরী মোন্টান। স্মিথ যদি আর মাত্র দু'সেকেন্ড দেরী করে ফেলত, তবে আর প্যারাস্যুট খুলতে হত না, তাকে সহ বিমান আশ্রয় নিত সমুদ্রগভর্তে।

যিথের সৌভাগ্য বলতে হবে, তার পতনের সময় ঐ বিস্তৃত মহাসাগরের আশেপাশে মাত্র নোকা উপস্থিত ছিল, তা ছিল লস এঞ্জেলসের এক উকিলের। উকিল ছুটির দিনে ছেলের সাথে মাছ ধরতে এসেছিল, পানি থেকে অচেতন যিথকে উদ্ধার করে তারা হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়।

এ দুর্ঘটনায় আগে বেঁচে গেলেও একত্রিশ বছর বয়স্ক যিথের দেহের ওজন কমে যায় প্রায় এক ত্রৃতীয়াংশ, তার চিকিৎসা করতে স্বেচ্ছায় এসেছিল উনিশজন চিকিৎসক, পুরো যুজরিট থেকে। দুর্ঘটনা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের হওয়ায় চিকিৎসা চলে অনেকখনই আনন্দজের ওপর। পাঁচদিন পরে যিথের জন ফেরে হাসপাতালের বিছানায় আর দুর্বল শরীর সত্ত্বেও চিকিৎসকদের ধারণার চেয়ে অনেক কম সময়েই সে সুস্থ হয়ে ওঠে এবং সক্রিয় দায়িত্বে আত্মনিয়োগ করে আবার।

৩.

মেরিন জুলজিস্ট রিচার্ড হ্যামডের ট্যাঙ্কি এসে থামল হিস্তো বিমানবন্দরের ট্যাঙ্কিওয়েতে। বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা সংস্থার একজন নতুন চাকুরে হিসেবে তার যোগ দেবার কথা, সময়টা ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাস, তাকে BOAC এর ৭১২ নং ফ্লাইটে জুরিখ হয়ে যেতে হবে।

বিমানে তার সহযাত্রী বেশ কিছু প্রবাসী পরিবার ছাড়া সকলেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত কিছু লোক, তারা জুরিখ থেকে অন্য ফ্লাইট ধরবে। এখানে হয়ত বোঝেগামী এক ভারতীয় বসেছে তার ব্যবসার কাগজপত্র খুলে, তো তিনটে আসন পরে বসেছে মধ্যপ্রাচ্যগামী একদল আমেরিকান। আর ঐ কোণায় সিঙ্গাপুরগামী দুই চাইনিজ জুড়ে দিয়েছে তাদের চ্যাঙ্গং ভাষায় সুখ দুঃখের গল্প। নিজের আসন খুঁজে পেতে রিচার্ড কিছুটা দমে গেল, কারণ আসনের পাশে জানালা দিয়ে বিমানের এক ডানার পেছন দিকটা দেখা যাচ্ছে মাত্র। অথচ আশায় ছিল জানালা দিয়ে যেমনের রাজ্য আর দূরের পৃথিবী দেখতে দেখতে যাবে। তার পেশাতে ফটোগ্রাফি অপরিহার্য হলেও সেটা তার নেশাও বটে। ব্যাগের মধ্যে বিশ্বস্ত ‘অ্র-২’ ৩৫ মি.মি ক্যামেরা ফিল্মসহ একেবারে তৈরী, অথচ ভাল কোন ছবি তোলার সুযোগটাই মাঠে মারা গেল।

‘হাইকি-ইকো’ নামক ৭০৭ বোয়িংটা একসময় রানওয়েতে এসে দাঁড়াল, উড়াল দিতে তা প্রস্তুত। উচ্চল বিমানবালা এসে সবার সেফটি বেল্ট পরীক্ষা করে নিল, আর দেখিয়ে দিল জরুরী পরিস্থিতিতে কি কি নিয়ম মেনে চলতে হবে। ঠিক চারটে সাতাশ মিনিটে ‘হাইকি-ইকো’র চাকা রানওয়ে ত্যাগ করে।

ডানার পাশে ছোট ত্রিভুজাকৃতি জ্যাগা দিয়ে রিচার্ড তাকিয়ে ছিল ক্রমশঃ অপসৃয়মান বিমানবন্দরের দিকে, বিমানটা একটা ঝাঁকি থেতেই সম্ভিত ফিরে এল, হয়ত বাতাসের

ঝাপটা লেগেছে! কিন্তু পরমুহুর্তেই নজর পড়ল জানালার বাইরে ডানার নীচে ভেতরের ইঞ্জিনটা থেকে বের হয়ে এসেছে লকলকে জিহ্বার মত একটা সোজা আগুনের শিখা।

ওহ! এতে ভয় পাবার কিছু নেই, নিজেকে সাত্ত্বনা দিল সে, হয়ত তারী বিমানের বেগ বাড়াবার জন্য কোন ধরনের বুটার ছোড়া হয়েছে, অথবা অতিরিক্ত জ্বালানী নষ্ট করার কোন পদ্ধতি এটা।

কিন্তু অতি দ্রুত আগুন বাড়তে লাগল, কয়েক সেকেন্ডের মাথায় দেখা দিল প্রায় দু'হাত লম্বা অগ্নিশিখা। গ্যাঙওয়েতে বসে থাকা চীফ স্টুয়ার্ড ব্যাপার দেখে ছুটে গেল পাইলটের কেবিনে। বিমান উড়য়েন আগে পরিবেশন করা পানীয়গুলো বিমানবালার দ্রুত সরিয়ে ফেলল, আর তীক্ষ্ণ নজর রাখল যেন কোন আলগা খুচরো জিনিস কোথাও পড়ে না থাকে।

হতভুব রিচার্ডের মাথা হঠাৎ দ্রুত কাজ করতে শুরু করল, ছবি তোলার এমন অন্তর্ভুক্ত বিষয় আর সুযোগ জীবনে আর পাওয়া যাবে না! দ্রুত ব্যাগ থেকে বের হয়ে এলো ‘এক্সা’ লেপ তাক করল জুলত ডানটার দিকে, তারপর টিপে দিল শাটার, অন্যান্য যাত্রীদের চোখে গেল এবার ব্যাপারটায়। কথাবার্তা আলাপ আলোচনার শব্দ কমে গিয়ে শুরু হল ফিসফিসানি, কেউ কেউ আবার মাথা ঘুরিয়ে দেখতে লাগল আগুন।

ইতোমধ্যে ইঞ্জিন থেকে আগুন ডানায় ছড়িয়ে পড়েছে, জানালা দিয়ে তাকালে শুধুমাত্র আগুনের একটা দেয়াল চোখে পড়ে। আগুনের আঁচে ডানার রঙের প্রলেপ চড়চড় শব্দে ফেটে উড়ে যাচ্ছে বাতাসে। এ পরিস্থিতিতে বিমানের পাইলট আর ক্রুদের সামনে একটা আশা পথই খোলা আছে, ৬,০০০ গ্যালন কেরোসিন বিফোরিত হওয়ার আগেই বাহকটাকে মাটিতে পুনরায় অবতরণ করানো। রোদে ঝলমল টেম্স নদীর ওপরে বিরাট বোয়িংটাকে বাঁ দিকে একটা তীক্ষ্ণ বাঁক নেয়ালো তারা। হাতে সময় আছে মাত্র দু'মিনিটের মত, ঘড়িতে তখন বাজে চারটা উন্নতিশি।

বিমানের ডানা থেকে আগুনটা ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে যাত্রীদের বসার জায়গার দিকে, অংগতির হার প্রতি তিন সেকেন্ডে এক ফুট করে। রিচার্ড দ্বিতীয় ছবিটা তুলতে তুলতে ভাবল, আজ আর কারও নিষ্ঠার নেই, বিমান রানওয়েতে পৌছানোর আগেই টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। জানালার মধ্যে দিয়ে আগুনের আঁচ এখনই অনুভব করা যাচ্ছে, দাউ দাউ করে জুলা বন ফায়ারের (Bon Fire) পাশে দাঁড়ালে যেমন লাগে।

বিমানের চাকা নেমে গেছে, এমন সময় যে ইঞ্জিনটা থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল, তা গলত লোহা লকডসহ ডানা থেকে খসে পড়ল। খুব সৌভাগ্যই বলতে হবে, জুলত ‘বোমাটা স্টেইন’ শহরের বাড়ীদের মাঝে ফিরে এল, পাত্র চেহারা কিন্তু কঠস্বর প্রসংশনীয় রকমের অবিচলিত।

বিমানের ভেতরটা ইতোমধ্যে নাট্যমধ্যের শক্তিশালী আলোর মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চীফ স্টুয়ার্ড ভীত সন্ত্রিত যাত্রীদের মাঝে ফিরে এল, পাত্র চেহারা কিন্তু কঠস্বর প্রসংশনীয় রকমের অবিচলিত।

আমরা জরুরী অবতরণ করতে যাচ্ছি, তয়ের কোন কারণ নেই। আপনারা অনুগ্রহ করে যার যার কোলে মাথা ঢেকে বসুন, আর দেখে নিন সেফ্টি বেল্টগুলো শক্তভাবে বাঁধা আছে কিনা। আবারও বলছি, ভয় পাবেন না, মাথা ঠাণ্ডা রাখুন।

একজন বিমানবালা এসে সেফ্টি বেল্টগুলো পরীক্ষা করে গেল, আগের বারের মতো হাসিখুশি না হলেও যাত্রীদেরকে আশ্বস্ত করার হাসি লেগে আছে ঠোটে। সে চলে যেতেই রিচার্ড চট করে মাথা তুলে তাকাল জানালার দিকে, তিনষ্টরের পুরু জানালার মধ্য দিয়ে আগুনের আঁচ তখন নির্বিবাদে থবেশ করছে। তৃতীয় ছবিটা তোলার জন্য প্রস্তুত হল 'এর'। দরদর করে ঘামছে রিচার্ড, হাতের চেটোয় ঘাম মুছে তৈরি আলোর দিকে তাকাল চোখ কুঁচকে। ক্যামেরার এক্সপোসার মিটারের কাঁটা ডায়াল থেকে ছিটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ক্যামেরা জানালায় বসিয়ে বিপরীত দিকে মাথা সরিয়ে নিল সে, তারপর টিপে দিল শাটার।

হাত দিয়ে মুখটা যতদূর সত্ত্ব আড়াল করে রেখে রিচার্ড আবার তাকাল আগুনের দিকে, হলদে কমলা ফুলকি ছড়িয়ে প্রচও উত্তপ্ত বাপ্স আঘাত হানছে যাত্রীদের আপাত নিরাপদ আশ্রয়টুকুতে। এক পর্যায়ে বোয়িং এর বাইরের দিকের জানালাগুলো প্রচও উত্তাপে ফেটে গেল, গলে পড়তে লাগল বুদবুদ তুলে।

বিমানের যখন এই ধূসলীলা চলছে, ভেতরের পরিবেশেও এর প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ল। যাত্রীদের বুকের ওপর চেপে বসেছে ভারী ধাতব নিষ্ঠন্দতা, মায়ের কোলে বসা একটি শিশুর খুনখুন করে কান্না ছাড়া আর কোন শব্দ নেই পুরো কেবিনে। কোলের ওপর মাথা রেখে একমনে রিচার্ড আশা করে যাচ্ছে যেন ব্যাপারটা দ্রুত শেষ হয়ে যায়। বিমানটা ঘাটিতে আছড়ে পড়ুক, পড়ে একবারে ধ্বংস হয়ে যাক, শেষ হয়ে যাক সবকিছু। জীবন্ত পুড়ে মরার চেয়ে তা ভালো। কাঁপা কাঁপা গলায় প্রার্থনা করতে লাগল সে।

বিমানটা হঠাতই একটা ঝাঁকি খেল, রানওয়ের সাথে চাকার ঘর্ষণে উঠল তীক্ষ্ণ অর্তনাদ, সে শব্দ এসে পৌছল যাত্রীদের কানে। আর অবশ্যে, তাদের বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে বিমানটা রানওয়েতে এসে থামল।

বিমানবালা কোণের এমার্জেন্সী এক্সিট খুলে দিল। আতঙ্কের সৃষ্টি না হলেও যাত্রীরা কেউ অথবা সময় নষ্ট করল না। ভৌত্তের ঠেলায় রিচার্ড আপনি এগিয়ে চলল এক্সিটের দিকে, ঠেলাঠেলিতে পেছনের এক লোক পা মাড়িয়ে দিল তার। ইষ্টিংরিয়া থামাতে গিয়ে এক মেয়ে খাবি খেতে লাগল, ছেট শিশুগুলো ভয়ে জুড়ে দিল কান্না।

বোয়িং থেমে পড়ায় আগুন এবার পূর্ণ মনযোগ দিল তার দিকে। ইতোমধ্যে কেবিনের পেছনদিকে ধোঁয়ার মেঘ ত্বরে ত্বরে ছড়িয়ে পড়ছে। দশ টন ফুটন্ট কেরোসিনের কয়েক ফুট সামনে ডানার তেলের ট্যাঙ্কগুলো একপর্যায়ে বিফোরিত হল প্রচও শব্দে, ছইকি 'ইকো'র বড় বড় টুকরো ছিটকে উঠে গেল আকাশে।

দমকলের তীক্ষ্ণ চিকিরণ, পুলিশের গাড়ী আর অ্যারুলিসের ভীড়ে যাত্রীরা বের হয়ে এল মুক্ত বাতাসে। এয়ারলাইনের স্টাফরা চেঁচিয়ে তাদের নির্দেশ দিল, পুরো বিমানটা

বিফোরিত হবার আগেই সবাইকে যতদূর সত্ত্ব সরে যেতে হবে। যারা দৌড়াতে বা হাঁটতে পারছে না, পুলিশ আর দমকলের লোকেরা তাদেরকে কোলে করে সরিয়ে নিল।

নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে রিচার্ড খটাখট আরও দু'টো ছবি তুলে নিল ক্যামেরায়। বিরাট এক বলের আকারে কালো ধোঁয়া সূর্যটাকে ঢেকে ফেলেছে, সে ধোঁয়ার ত্বরের গোড়ায় দাউ দাউ করে জুলছে ছইকি 'ইকো'র অবশিষ্টাংশ। মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছে, লেজ ঢাকা পড়েছে আগুন আর ধোঁয়ার আড়ালে, অঞ্জিজেন ট্যাঙ্কগুলো ফাটছে দুমদাম। মাত্র একমিনিট আগেও যে আসনগুলোতে যাত্রীরা বসে ছিল, তা এখন আগুনের খাদ্য। প্রথম অগ্নিশুলিসের জন্ম থেকে এই ধূসম্যজ্ঞ, সমস্ত ঘটনা ঘটতে সময় লেগেছে চার মিনিটেরও কম।

ট্যারম্যাকে ক্লান্ত বিধ্বস্ত যাত্রীদের কাগজের কাপে কফি বিতরণ করা হল। একজন বিমানবালা এখনও বিমানের ভেতরে, সুন্দর চুলের একটা ছোট মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সর্বশেষ পাওয়া খবর আনুযায়ী দেখা গেল, ১১৬ জন যাত্রী ও ১১ জন ক্লু'র মধ্যে পাঁচজন বাদে আর সবাই রক্ষা পেয়েছে। উদ্ধার কার্যের জন্য প্রাণ পঞ্চান্ন সেকেডের মধ্যে তাড়াতাড়ি বের হতে গিয়ে আহতের সংখ্যা আটগুলি।

অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জুওলজিস্ট রিচার্ড হ্যামন্ডের তোলা ছবিগুলো মূল্যবান প্রমাণ হিসেবে তদন্তকারী কর্মকর্তাদের অনেক সাহায্য করেছিল। টেক্টাকফের সময় ছইকি 'ইকো' পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করায় তার ইঞ্জিনের ক্ষেপসারের চাকা ভেঙে যায়। ভাঙা ড্রেগুলো ছিটকে বেরিয়ে যাবার সময় তাদের এলোপাথাড়ি ধাক্কায় জ্বালানীর পাইপ, বেদ্যুতিক সার্কিট আর আগুন নির্বাপণী পাইপগুলোকে ভেঙে দিয়ে যায়।

ছইকি 'ইকো'র নিউজিল্যান্ডবাসী দক্ষ পাইলট ক্যাপ্টেন চার্লস টেইলরকে পরবর্তীতে বিটিশ এয়ারলাইন পাইলট এসেসিয়েশনের পক্ষ থেকে স্বীকৃত দেয়া হয়, একটা ইঞ্জিন হারিয়ে এবং অপর ইঞ্জিন প্রায় অকেজো অবস্থায় ছইকি 'ইকো'কে নিখুঁত অবতরণ করানোর জন্য। চীফ স্টুয়ার্ড নেভিল ডেভিস গর্ডনকে সাহসিকতার জন্য দেয়া হয় বিটিশ এস্পায়ার পদক, ঠাণ্ডা মাথায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সে যাত্রীদের জুলত বিমান থেকে বের করে এনেছিল।

কিন্তু এই দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশী মূল্য দিতে হল ছোটখাট হাসিখুশি বারবারা হ্যারিসনকে, যে বিমানবালা হিস্ট্রো'তে যাত্রীদের স্বাগত জানাতে বিমানের দরজার পাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকত। আগুনের হস্তায় যখন এমার্জেন্সী এক্সিটটা খসে পড়ল, সে তাড়াতাড়ি বাদবাকি যাত্রীদের বিমানের সামনের দিকে নিয়ে যায়। এ নরকের মাঝে ফিরে যাবার চেয়ে অতি সহজেই সে পালিয়ে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারত। সে জানত এই ধোঁয়ার মাঝেই বিমানের পেছনদিকে কোথাও ভীত বিহুল দুই নারী পড়ে আছে, এক পঙ্গু বৃক্ষ আর একটি ছোট মেয়ে, মায়ের জন্য যে কেঁদে আকুল হচ্ছে। তাদেরকে রক্ষা করতে গিয়ে রক্ষাকর্তা নিজেই বলি হল ধূসম্যজ্ঞের।

বিমান নিয়ে কথা

বারবারা'কে দেয়া হল জর্জ ক্রস, সাহসিকতার জন্য ব্রিটেনে সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান। আর দুর্ঘটনার রিপোর্টে লেখা হল, বারবারা হ্যারিসন, একজন সাহসী নারী, কর্তব্যপালনে যে নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছিল।

8.

নিজ দায়িত্বে আন্তরিকভাবে বিশ্বস্ত বিমান ক্রুদের কাহিনীগুলো পড়ে এমন ধারণা নেবার কোন কারণ নেই যে, সকলেই একরকম। বরং ক্ষেত্রবিশেষে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ঘটনাও ঘটতে দেখা গেছে।

১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস, জাপানের হানেদা বিমানবন্দর, জাপান এয়ারলাইসের (J.A.L) ডি.সি. এইট যাত্রীবাহী বিমানের ঢাকা রানওয়ের শক্ত পিঠ স্পর্শ করল। অবতরণ প্রক্রিয়ার কম্পিউটার কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে তাকে যান্ত্রিক স্বরে নির্দেশ দিচ্ছে।

চালুর দিকে সরে যাও, চালুর দিকে স..... মাত্র পাঁচ সেকেন্ডের ব্যবধান, পরমুহূর্তে বিমানের বিশাল দেহ আঘাত হানল রানওয়ের একপাশে স্টীল অ্যাপ্রোচ লাইট এর সারিতে। মোটা বৈদ্যুতিক পাইলন চাপ সহ্য করতে পারল না, তা ছিঁড়ে বিমান নিয়ে পড়ল পাশের টোকিও উপসাগরে।

উপসাগরের পানিতে অর্ধভূত বিমান থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করতে সাথে সাথে ছুটে এল অ্যাসুলেন্স, নিরাপত্তাকারী আর রেঙ্কিউ বোট, সাথে উদ্ধারকারীরা। দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হল ৭৮ জন যাত্রী, নিহতের সংখ্যা শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল ২৪ এ, আপাতদৃষ্টিতে একটা নিখুঁত ল্যাভিং এ এমন কি ঘটেছিল শেষমুহূর্তে, যে আর শেষরক্ষা করা গেল না? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে টোকিও পুলিশ বিমান চালকের ব্যক্তিগত কুটির আভাস পেল। এ পর্যায়ে জে.এ.এল. প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এল এক অপ্রত্যাশিত স্বীকারোক্তি।

দুর্ভাগ্য বিমানটির ৩৫ বছর বয়স্ক পাইলট সেইজী কাতাগিরি এর সাইকোসোমাটিক (এক প্রকার মানসিক রোগ) অসুস্থতার ইতিহাস রয়েছে।

হাসপাতালে আহত পাইলট কাতাগিরি দুর্ঘটনা তদন্তকারী কর্মকর্তাদের কারণ দর্শাতে গিয়ে বলল যে বিমান পথচাত হবার ঠিক কয়েক মুহূর্ত আগে সে কক্ষিপটে জ্বান হারায়। জ্বান হারাবার কারণ ছিল প্রচণ্ড আতংক আর গা বমি বমি ভাব। অথচ বিমানবন্দরের দিকে অগ্রসর হবার সময় কক্ষিপটে কি ঘটেছিল তার সম্পূর্ণ ভিন্ন কিন্তু আরও জীবন্ত বর্ণনা দিল এ সময়ে সেখানে উপস্থিত দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কোপাইলট ইয়োশিফুমি ইশিকাওয়া।

বিমান নিয়ে কথা

ইশিকাওয়ার বর্ণনা অনুযায়ী ঘটনার শুরু দুর্ঘটনার ২৪ ঘন্টা আগে, টোকিও থেকে ফুকুওকাগামী একটা রুটিন ফ্লাইটে। পাইলট কাতাগিরি এবং কোপাইলট ইশিকাওয়া'র দায়িত্বে বিমান টোকিও ছাড়ে নিরাপদে। বিমান যখন মাঝে আকাশে, সবকিছু ঠিকঠাক মতো চলছে, কোন পূর্বাভাস ছাড়া পাইলট হঠাৎ বিমানটিকে তাঙ্কে এক বাঁক দেয়াল। সাথে সাথে বিমান হল নিম্নগামী। ব্যাপার দেখে 'ইশিকাওয়া তাড়াতাড়ি বিমানের নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে নিল, ইতোমধ্যে তা বিপদজনকভাবে উচ্চতা হারিয়েছে ১,১০০ ফুট। অনেক ঘামলোর পর বিমানকে আগের উচ্চতায় ফিরিয়ে আনল সে। বাকি পথটুকু কেটে গেল নির্বাঙ্গাটে। অবতরণের পর ইশিকাওয়া পাইলটকে তীব্র ব্যাসেক্সি করে,

বাহ! আজকে বেশ ভালই একটা কাজ দেখালে যা হোক!

এ ঘটনার রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের হাতে পৌছল না, কারণ ইশিকাওয়া 'ব্যস্ততা'র জন্য করে উঠতে পারেনি। ফিরতি ফ্লাইটে যখন তার সময় হল, ততক্ষণে সে ফ্লাইটটা টোকিও উপসাগরে সমাপ্তি লাভ করেছে। সময়মত রিপোর্ট করতে এ ব্যর্থতায় সহকর্মীদের অনেকেই অবাক হয়নি। কারণ, পাইলটরা বিমান পরিচালনা কমিটির সদস্য, কিন্তু কোপাইলটরা নয়। ১৯৭০ এর দিকে জে.এ.এল. বিমান সংস্থায় সংখ্যাধিক্য কোপাইলট বিশ্বাস করে, কোন পাইলটের ভ্রান্তি সম্পর্কে রিপোর্ট করা মানে নিজ হাতে চাকুরির ভবিষ্যৎ নষ্ট করা।

টোকিও থেকে ফুকুওকা যাবার আগে কাতাগিরি'র সাথে ইশিকাওয়া'র ওড়ার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। পুলিশের জবানবন্দীতে সে বলে,

- আমি তখন ভেবেছিলাম ক্যাপ্টেন বুবি আমার কর্মদক্ষতা পরীক্ষা করছে।

- যদি কোপাইলট ইশিকাওয়া ঘটনাটা কাউকে বলতে পারত। আমি জানিনা সে ব্যক্তিটিকে, এই এয়ারলাইসেরই একজন পাইলটের বক্তব্য হল, ম্যানুয়ালে লেখা আছে এসব ক্ষেত্রে তুমি অবশ্যই মুখ খুলতে পার তা ঠিক। কিন্তু পরিকার করে কোথাও উল্লেখ নেই কাজটা কার কাছে, কখন কিভাবে করতে হবে।

টোকিও'র ফিরতি যাত্রায় বিমান যখন হানেদা বিমানবন্দরের আকাশে, কাতাগিরি'র মাথায় আবার পাগলামী চাড়া দিয়ে ওঠে। ইশিকাওয়া'র ভাষ্য অনুসারে পাইলট ডি.সি. এইটাকে হঠাৎ নোজ্ডাইভে (Nose dive, বিমানকে নিম্নমুখী করে দ্রুত এর উচ্চতা কমিয়ে ফেলার প্রক্রিয়া) নিয়ে যায়। ইশিকাওয়া পূর্বের মত বিমানের নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে নিতে গেলে এবার বাধাৰ সম্মুখীন হল, সে বাধা দ্রুত গড়াল হাতাহাতিতে। কক্ষিপট রেকর্ডারে উদ্ধার করা শেষ মুহূর্তের কথাগুলো হল,

- ক্যাপ্টেন! ইয়ামেতে কুদাসাই! অর্থাৎ, ক্যাপ্টেন, দয়া করে এটাকে থামাও!

বিমান রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ার মুহূর্তে পাইলট কাতাগিরি আত্মত্বির সাথে স্বগতোক্তি করে,

বিমান নিয়ে কথা

- আহ! কাজটা তাহলে শেষ পর্যন্ত করলাম!

সাহায্যের জন্য প্রথম রেক্সি বোটটা আধ ডোবা বিমানের গায়ে এসে ভিড়লে সাধারণ এয়ারলাইন কর্মীর পরিচয়ে তাতে সর্বপ্রথম চেপে বসে কাতাগিরি স্বয়ং, তার দায়িত্বে থাকা সকল সাধারণ যাত্রীদের উপেক্ষা করে।

ইশিকাওয়া'র এধরনের জবানবন্দিতে পুলিশ কাতাগিরির অতীত ঘাটতে শুরু করল। তাতে জে.এ.এল. কর্তৃপক্ষ পড়ে গেল বেশ বেকায়দায়, কারণ চমকপ্রদ তথ্য যা বের হল, তার প্রতিটিই নির্দেশ করে তাদের দায়িত্বহীনতাকে। দু'বছর আগে, ১৯৮০তে কাতাগিরিকে তিনি সঙ্গাহের জন্য বরখাস্ত করা হয়েছিল, কারণ এয়ারলাইসের ডাক্তার তার মাঝে সাইকোসোমাটিক অসুস্থতার লক্ষণ খুঁজে পায়। অথচ জাপানে পাইলট সার্টিফিকেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে ঘটনার কিছুই জানানো হল না। কর্তৃপক্ষ এ দোষ চাপিয়ে দিল ডাক্তারের ওপর যেন মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট করার দায়িত্ব তার!

'৮০ এর নভেম্বরে তিনি সঙ্গাহ নিক্রিয় থাকার পর পুনরায় ডাক্তারী পরীক্ষায় তাকে 'সম্পূর্ণ সুস্থ' বলে রায় দেয় হয়। লাইসেন্স সঞ্চিয় রাখতে কিছু কিছু সীমাবদ্ধ ফ্লাইটের দায়িত্ব দেয়া হল তাকে। পুলিশ তদন্তে এর বেশি কিছু জানা গেল না। কিন্তু ঘটনার এখানেই শেষ নয়। '৮০ এর আগস্টে কাতাগিরি'র ফোন পেয়ে পুলিশ ছুটে যায় তার ফ্লাইটে, তার সন্দেহ, স্থানে 'বাগ' বসান হয়েছে (Bug, সুন্দাকৃতির মাইক্রোফোন, গোপনে কথা শোনার জন্য ব্যবহৃত হয়)। তারা পৌছলে উত্তেজিত কাতাগিরির কথা থেকে বুঝতে পারে তার ছাদের নীচে নাকি 'বাগ' বসানো হয়েছে, গোপনে তার কার্যকলাপের ওপর লক্ষ্য রাখতে। পুলিশ অবশ্য কোন 'বাগ' খুঁজে পেল না, শোবার ঘরের ছাদে একটা ছিদ্র ছাড়া, কিন্তু তা কাতাগিরি'র কর্ম। এথেকে বোঝা যাচ্ছে পরিকার যে, ডাক্তারী পরীক্ষার অনেক আগে থেকেই সে অসুস্থ ছিল। আশ্চর্যজনকভাবে ডাক্তার এবং কোপাইলটের মতো পুলিশের খাতায়ও এ ঘটনার কোন রিপোর্ট লেখা হল না। ব্যাপারটা কারও নজরে আসত না, যদি না এক সাংবাদিক কাতাগিরি'র জীবনযাত্রা সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে জোর তদন্ত করত এ বিমান দুর্ঘটনার পরে।

তদন্তের রিপোর্টের দুর্ঘটনা কারণ হিসেবে একটা ব্যাপারই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেল, আর তা হল জে.এ.এল. কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা, রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর জনমনে যে তৈরি প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তাতে জে. এ. এল. কর্তৃপক্ষ বাধ্য হল তাদের 'চোখ কান মুখ' বন্ধ নীতি পাল্টাতে। এয়ারলাইনের প্রেসিডেন্ট তাকাগী প্রায় এক সঙ্গাহ ব্যয় করলেন মৃত ২৪ জন যাত্রীর ঘনিষ্ঠ আঘাত স্বজনের সাথে দেখা করতে গিয়ে। প্রত্যেকের সামনে তিনি হাঁটু গেড়ে মাথা নীচু করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তবু কর্তৃপক্ষের গাফিলতির বলি এই ২৪ জনের অনেকের পরিবারই মন থেকে তিক্ততা মুঝে ফেলতে পারেন।

বিমান দুর্ঘটনার গোপনীয়তা প্রকাশ

১.

একই মানুষকে 'মৃত' ঘোষণা করা, তাও অতি অল্প দিনের ব্যবধানে ভিন্ন দুটি তারিখে, ব্যাপারটা অভিনব নয় কি? এমনটা ঘটেছিল একজন ব্যাংক ডাক্তার কার্ল জনসনের ক্ষেত্রে। কার্লের চাকুরিস্থল শিকাগো'র এক ব্যাংক থেকে ১৯৭৫ সালে প্রায় ৬ লক্ষ ১৫ হাজার ডলার লোপাট দিয়ে সে নিজেই লোপাট হয়ে যায়। তার অনুপস্থিতিতে স্তৰ লুইস তাকে 'মৃত' বলে দাবি করতে থাকে। লুইসের চাপাচাপিতে ৭ বছর পরে অবশেষে ১৯৮২ সালের ৪ঠা নভেম্বর আদালত কার্লকে 'সরকারী ও আনুষ্ঠানিকভাবে মৃত' ঘোষণা করল।

এ ঘোষণার এক সঙ্গাহের মাথায় ওহায়ো'র মটোগোমারিতে জোড়া ইঞ্জিনের একটা 'সেস্ন' বিমান ক্র্যাশ করে। তার যাত্রী সংখ্যা ছিল হয়, যারা সকলেই মারা পড়ে এ দুর্ঘটনায়। যাত্রীদের পরিচয়ে পাওয়া গেল চারজন এফ.বি.আই. এজেন্ট এবং একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার। মজার ব্যাপার হল, দীর্ঘ সাত বছর ধরে যার ছায়াও লোকে দেখেনি, আদালত ঘোষণার মাত্র এক সঙ্গাহের মাথাতে তার নাম আবার লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। কারণ বিমানের ষষ্ঠ যাত্রীটির মৃতদেহ আর কারও নয়, অবধারিতভাবেই ৪৫ বছর বয়স্ক কার্ল জনসনের।

আসলে সবাই যখন কার্লকে মৃত ভাবে, তখন সে স্যান ডিয়োগোতে বেঁচে আছে বহাল তবিয়তে, ধর্মীয় বিজ্ঞান চার্চ কেন্দ্রের একজন সংক্রিয় কর্মী হিসেবে। ডিসেম্বরের ২ তারিখে সে কর্তৃপক্ষের কাছে আস্তসমর্পণ করে, এর আটদিন পরে এফ.বি.আই. এজেন্টদের পথ প্রদর্শক হিসেবে কার্ল চাপে এ 'সেস্ন'য়। শিকাগো'র সিনসিনাতিতে কোথাও ব্যাংক লুটের ৫৫ হাজার ডলার লুকান আছে যার খোঝ একমাত্র কার্ল ছাড়া আর কেউ জানে না। এ যাত্রা কার্লের জন্য হল শেষ যাত্রা, আর এফ.বি.আই. এজেন্টদের জন্য একক দিনে সবচেয়ে বড় ক্ষয়ক্ষতি।

এফ.বি.আই সদৃশ আরেকটি মার্কিন ইন্টেলিজেন্স সংস্থা সি.আই.এ। বিমান দুর্ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ ও টপ সিক্রেট পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাওয়াটা তাদের ইতিহাসেও বিরল নয়, বিশ্ব রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এমন দু'টি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়।

ইউ.টু. গুগ্চর বিমানের স্রষ্টা ছিল ইউ.এস. বিমানবাহিনীর রিচার্ড বিসেল ও ট্রেভর গার্ডনার এবং লক্ষ্মিড এর ক্ল্যারেন্স জনসন। তাদের এই প্রোজেক্ট ৭ই জুন, ১৯৫৪তে উত্থাপনের প্রায় সাথে সাথে পেন্টাগণ বাতিল করে দেয়। এ বছরেই ডিসেন্টেরে অবশ্য বিসেলদের ক্রমাগত তদ্বিরে প্রতিরক্ষা বিভাগ আল্ট্রা সিক্রেট এসপিওনাজ প্রজেক্টটাকে অবশ্যে এগিয়ে নিতে সম্মত হল। '৫৫ এর আগস্টে ইউ.টু'র প্রথম মডেলটি ডানা মেলে মুক্ত আকাশে। ১৯৫৬ থেকে শুরু করে পরবর্তী চার বছরে সে রাশিয়ার ওপর দিয়ে উড়ে যায় বেশ কয়েকবার, সেখানকার সামরিক বিমানঘাঁটি, আকাশযান, মিসাইল তৈরী ও প্রশিক্ষণ, বিশেষ অন্তর্ভুক্ত ভাগ, সাবমেরিন আর পারমাণবিক উৎপাদন সম্পর্কিত প্রচুর মূল্যবান ছবি ও তথ্য পাচার করে আনে। বিমানটা ভূমি থেকে ৮০,০০০ ফুটেরও ওপর দিয়ে উড়ছিল বলে সোভিয়েত বিমান বিধ্বংসী কামানের গোলা তার নাগাল পায়নি।

১৯৬০ সালের ১৬ই মে'তে পারম্পরিক মত বিনিময় অন্তর্ভুক্ত নিয়ন্ত্রণ ও শাস্তি আলোচনায় বসার কথা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার, ফ্রাসের প্রেসিডেন্ট দ্যগল, ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলন এবং সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশেভ এর, প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য এই আলোচনার তারিখ যতই এগিয়ে এল ইউ.টু গুগ্চর বিমানের অভিযান নিয়ন্ত্রণকারীরা ভবিষ্যতের চিন্তায় ততই শক্তিত হয়ে পড়ল। শাস্তি আলোচনা ও পরে আইসেনহাওয়ারের সোভিয়েত সফর সফল হলে অনিদিষ্টকালের জন্য এই ব্যয়বহুল অভিযান বন্ধ হয়ে যাবে, তা নিশ্চিত।

ইউ.টু গুগ্চর বিমানের প্রতিটি অভিযানের পেছনে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের পূর্ণ সম্মতি ছিল। প্যারিস বৈঠকের তারিখ এগিয়ে এলেও সে অভিযান বন্ধ করল না। এ বাড়াবড়ির ফল সে পেল হাতে নাতে, এবং পেল খুব শিগগীরই। ১লা মে ফ্রাসিস গ্যারি পাওয়ার নামক জনৈক সি.আই.এ পাইলট ও তার উড়োয়ামান ইউ.টু'কে আঘাত হানল রাশিয়ান গোলা, উরাল পর্বতাঞ্চলে সেবর্দ্লভ্স্ক এর আকাশে।

৫ই মে ক্রুশেভ ঘোষণা দিল, একটি অনাহৃত বিমানকে সোভিয়েত রাজের সীমানার ভেতরে ভূপাতিত করা হয়েছে। এতে মার্কিন সরকারের সর্বোচ্চ কাউন্সিলে সৃষ্টি হল একটা গোলযোগের। ওয়াশিংটন দাবি করতে লাগল, ওটা নাসা'র একটা আবহাওয়া বিমান। তুরক্ষের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় পাইলটের অ্রিজেন সরবরাহে অসুবিধা দেখা দেয়, ফলে তা বাধ্য হয় রাশিয়ার আকাশসীমা লজ্জন করতে।

ওভাল অফিসের যুক্তি হজম করতে ক্রুশেভ মার্কিনীদের দু'দিন সময় দিল, তারপর ফাটল আসল কথাটা

- অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, চালকসহ অনাহৃত বিমানটি এখন আটক রয়েছে আমাদের হাতে।

স্বরাষ্ট্র দণ্ডের এবারে বাধ্য হল গুগ্চর বিমানের কথা স্বীকার করে নিতে, তবে একথাও সাথে যোগ করতে ভুল না যে, এই বিমানের অভিযানে ওয়াশিংটনের অনুমতি ছিল না। বিশ্ববাসীর চমক তখনও শেষ হয়নি। এর দু'দিন পরেই কোন অঙ্গাত কারণে মত পাল্টাল সরকার, আইসেনহাওয়ার স্বয়ং এ অভিযানের দায়িত্ব স্বীকার করে নিল। শুধু তাই নয়, পরিকার বলে দিল,

- এ ধরনের অভিযান সোভিয়েত রাজের ওপর অব্যাহত থাকবে।

ফেটে পড়ল ক্রুশেভ, প্যারিস বৈঠকে সকলের সামনে সোভিয়েতের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমা প্রার্থনা দাবি করে বসল। আইসেনহাওয়ার চাপের মুখে পড়ে ঘোষণা দিল যে আর কোন ইউ.টু সোভিয়েত আকাশসীমা লজ্জন করবে না কিন্তু এ ঘোষণা রক্ষা করতে পারল না প্যারিস বৈঠককে, তেওঁ গেল শাস্তি আলোচনা।

সোভিয়েত সীমানার ভেতরে বিমানটাকে আঘাত করা হয়েছে, এ খবর জেনেও আইসেনহাওয়ার প্রথমে সেটাকে আঞ্চলিক সাথে 'আবহাওয়া বিমান' হিসেবে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন কি চিন্তা করে? সেসময় এ প্রশ্ন অনেকের মনেই খটকা জাগায়। কিন্তু এর উত্তর পাওয়া গেল ঘটনার প্রায় চার বছর পর, এ সম্পর্কিত সি.আই.এ. এর এক তথ্য ফাঁস হয়ে গেলে। সে তথ্য অনুযায়ী ইউ.টু বিমানটি তিন পাউন্ড ওজনের সাইক্রোনাইট বহন করছিল একটি আঞ্চলিক ইউনিটে, যা সম্পূর্ণ বিমানটি একবারে ধ্বংস করে দেবার জন্য যথেষ্ট। পাইলট পাওয়ারের ওপর নির্দেশ ছিল রাশিয়ার উর্ধ্বকাশে কোন অসুবিধা দেখা দিলে বিমানটিকে ধ্বংস করে দিতে, সি.আই.এ আশা করেছিল এতে 'প্রমাণ' নষ্ট হয়ে যাবে। সকল আঞ্চলিক ইউনিটের বোতাম টিপে বিমান থেকে বের হয়ে পড়ার। তারা নিরাপদে বের হবার পরই বিমান ধ্বংস হবে, এধরনের একটা ধারণা তাদের দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল তাদের কেউই নিশ্চিত ছিল না বোতাম টেপার পর নিরাপদে বের হয়ে আসার জন্য তারা ঠিক কতটুকু সময় পাবে। কেউ সাক্ষাতে বলেছে পাঁচ মিনিট, কেউ বলেছে সাত মিনিট। আঞ্চলিক ইউনিটটা যে ঠিক কিভাবে কাজ করে, সে ব্যাপারেও তারা পরিকার নয়।

রাশিয়ানদের হাত থেকে ছাড়া পাবার পর সিনেটে পাওয়ার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন,

বিমানকে সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানলে আমার হাত তৎক্ষণাত চলে যায় 'ডেস্ট্রাক্ট' বোতামে, কিন্তু পরমুহূর্তে মনে হল একটা শেষ চেষ্ট করে দেখি, যদি পালিয়ে

আসতে পারি। আমি জানতাম ঐ বোতাম টেপা থেকে বিষ্ফেরণ ঘটা পর্যন্ত সত্ত্ব সেকেন্ডের পার্থক্য রয়েছে।

পাওয়ারের সাক্ষ্য অনুযায়ী বিমানটিকে সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানলে বিষ্ফেরণের ধাক্কা তাকে কক্ষিপ্রতির সামনের দিকে ছুঁড়ে দেয়। এজন্যই সে 'অটো ইঞ্জেকশন সিস্টেম' এর বোতাম টিপে বিমান থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি।

'ডেক্সট্রাস্ট সিস্টেম' এর অসঙ্গতি রাজনৈতিক গোলোয়েগে চাপা পড়ে যায়, আসলে চাপা দেয়া হয়। কারণ সি.আই.এ. কোন কাঁচা পরিকল্পনা করেনি, 'ডেক্সট্রাস্ট' বোতাম টেপা এবং ইউ টু বিষ্ফেরিত হওয়া দুই ঘটনার মাঝে সময়ের প্রকৃত পার্থক্য এক সেকেন্ডও ছিল না।

৩.

ইউ টু শুণ্ঠৰ বিমান নিয়ে গোলমালের ঠিক একবছর পরের কথা, ১৯৬১ সালে নিকারাগুয়া'র পুয়ের্টো ক্যাবেজাস এয়ারফিল্ড। নিকারাগুয়া সরকারের অনুমতি নিয়ে স্থান্টা সি.আই.এ. ব্যবহার করছে তার ইতিহাসের সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য।

কিউবা তখন ফিডেল ক্যাস্ট্রোর সমাজতাত্ত্বিক সরকারের অধীনে, দুই পরাশক্তির অন্যতম সোভিয়েত ইউনিয়ন তার পেছনে। ক্যাস্ট্রো'র সামরিক শক্তিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে সমাজতন্ত্রকে দুর্বল করে দেয়ার উদ্দেশ্যে সি.আই.এ.'র এই পরিকল্পনা। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে তিনি ধাপে। প্রাথমিক পর্যায়ে সি.আই.এ. প্রশিক্ষণপ্রাণী কিউবান নির্বাসিতদের চালিত আটটি বিমানের বহুর বাহিয়া দ্য কোচিনোস' বা 'বে অফ পিগ্স' (Bay of Pigs) এ ক্যাস্ট্রো'র বিমান শক্তি এবং অন্ত ও মালামালের ওডামে বোমা বর্ষণ করবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে হবে আরেকটি মাঝারি আকারের বিমান আক্রমণ। এভাবে সেখানকার অধিকাংশ বিমান ও গোলাবারুদ্ধ ধ্বংস হয়ে গেলে প্রথম বিমান আক্রমণের ঠিক আটচল্লিশ ঘন্টা পরে ইউ.এস. নেতীর যুদ্ধজাহাজের প্রহরায় কিউবান নির্বাসিতদের চালিত আধ ডজন যুদ্ধজাহাজ একযোগে আক্রমণ করে দখল করবে 'বে অফ পিগ্স'।

উপসাগরীয় অঞ্চলটা আক্রমণের জন্য বেছে নেয়া হয়েছিল মূলত ভৌগোলিক কারণে। এখানকার সমুদ্রতটে পৌছতে মাত্র দু'টো স্থলপথ খোলা, তার দু'পাশে আবার বিস্তীর্ণ জলাভূমি। বিমান আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়েই পথ দু'টোকে বোমা মেরে উঞ্চিয়ে দেয়া গেলে ক্যাস্ট্রো বাহিনীর সামনে আর কোন বিকল্প পথ খোলা থাকবে না নতুন সেনাদল নিয়ে সেখানে হাজির হবার। আপাতদৃষ্টিতে পরিকল্পনার

কোথাও ফাঁক খুঁজে পাওয়া গেল না, শিগগীরই তা অনুমতি পেয়ে গেল সি.আই.এ. প্রধান, জয়েন্ট চীফ অফ স্টাফ এবং ব্যাং প্রেসিডেন্ট কেনটীর।

নিকারাগুয়ায় পুয়ের্টো ক্যাবেজাস ঘাঁটির নতুন সংকেতিক নামকরণ হল, 'হ্যাপি ভ্যালি'। প্রশিক্ষণের সময় আটজন কিউবান নির্বাসিত পাইলটের পাশাপাশি যুক্ত করা হল নবম একজনকে, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে। এই নবম ব্যক্তিটির নাম মারিও জুনিগা। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক এই কিউবানের অভিযানের উদ্দেশ্য, ক্যাস্ট্রো'র বিমানবাহিনীর সদস্যের অনুকরণে তৈরী একটি বিমানকে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইতে উঞ্চিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং বাহিরিশ্বের কাছে প্রচার করা যে বে অফ পিগ্স সংঘটিত বিমান আক্রমণ ক্যাস্ট্রো'র বিমানবাহিনীর কিছু বিদ্রোহী সদস্যের নিজস্ব পরিকল্পনা। অর্থাৎ এতে যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোন দেশের হাত নেই, তারা 'দেশপ্রেমে' উদ্বৃদ্ধ হয়ে নিজেরই এ কাজটা করছে।

১৫ই এপ্রিল, শনিবার, রাত ১টা ৪৫মিনিট। জোড়া ইঞ্জিনের এক বিরাট বোম্বারের কক্ষিপ্রতি অবস্থান নিল জুনিগা, এ যাত্রায় কোন কোপাইলট তার সঙ্গী হবে না। বিমানের নাকে কাল অক্ষরের বড় বড় করে লেখা- ৯৩৩, আর লেজে- এফ.এ.আর. 'ফুয়েরজা অ্যারেয়া রেতোল্যুশনারিয়া', ক্যাস্ট্রো'র বিমানবাহিনীর সদস্যের চিহ্ন। জুনিগা বিমানে ওঠার আগেই অবশ্য সি.আই.এ. এর লোকেরা বোম্বারটাকে রানওয়েতে টেনে এনেছিল, তারপর মেশিনগানের গুলি চালিয়ে দিয়েছিল ওটার ওপর। ফলে ফিউসিলেজে দেখা দিল বুলেটের ছিদ্র। পুরো ব্যাপারটায় আরেকটু বিশ্বাসযোগ্যতা যোগ করতে জুনিগার পকেটে এক সহকর্মী ঢুকিয়ে দিল এক প্যাকেট কিউবান সিগারেট। কক্ষিপ্রতি যখন সে চাপল, বুক পকেটে তার কিউবান সিগারেটের প্যাকেট, আর মাথায় সহজ সতর্কতায় তৈরী একটি 'কাহিনী', সামনে কতদিন তাকে এ 'কাহিনী' লোকের কাছে আওড়াতে হবে কে জানে !

রাত ১:৫০টা, জুনিগা রওনা হল তার 'বিধ্বন্ত' বোম্বার নিয়ে, গন্তব্যস্থল ৮৩৪ মাইল দূরে যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। স্তৰি জর্জিনা, পুত্র এন্দুয়ার্দো ও এনরিকো এবং কন্যা বিয়েট্রিজ ও মারিয়া ক্রিস্টিনাকে সি.আই.এ আগেই সরিয়ে ফেলেছে মিয়ামির এক ফ্লাটে।

জুনিগা রওনা হবার সমান্য আগে, রাত ১:৪০টায় অপর আটটি বি- ২৬ একই জায়গা থেকে রওনা হয়েছিল, তাদের প্রত্যেকের পেটে অতিরিক্ত জ্বালানী আর ২৬০ পাউন্ড করে বোমা। কাজের সুবিধার্থে তাদেরকে তিনটি ছোট দলে ভাগ করা হয়, 'লিভা' 'পুমা' আর 'গেরিলা' সাংকেতিক নাম। লিভা'র দায়িত্বে লুই কস্ম, পুমা'তে জোসে ক্রেস্পো এবং গেরিলা'তে গঞ্জালো হেরেরা। লিভা'র গন্তব্যস্থল হাতানার ২৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে, স্যান অ্যান্টোনিও দ্যলা ব্যানোস-এর প্রধান সামরিক বিমানঘাট। পুমা'র দায়িত্ব হাতানা'র ঠিক প্রান্তে অবস্থিত জ্যাম্প লিবার্টেড বিমানঘাট। গেরিলা'র লক্ষ্যস্থল স্যান্ডিয়াগো দ্যা কিউবা'র বিমানঘাট, যেখান থেকে পাঁচ বছর আগে ক্যাস্ট্রো তার যাত্রা শুরু করে।

ভোর ৬:০০টা, অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ নিয়ে ঘুম জড়ানো হাতানা'র ওপর আকস্মিক আক্রমণ নেমে এল। পুমা'র বোমার আঘাতে ক্যাম্প লিবার্টেডএ গোলাবারুদের গুদাম উড়ে গেল, এলোপাথাড়ি বোমার টুকরা'র আঘাতে রানওয়েতে সৃষ্টি হল বড় বড় গর্ত, প্রশাসনিক ভবনের দেয়াল ভেদ করে ঢুকে পড়ল স্প্লিটার। স্যান অ্যান্টেনানিও-তে লিভার আক্রমণে রানওয়েতে অপেক্ষমান টি-৩০ জেট ট্রেইনার বিফোরিত হল, সাথে সাথে আগুন ধরে গেল সেখানকার অপর কিছু বি-২৬ এ। মাত্র পনের মিনিট স্থায়ী এ আক্রমণের ক্ষয়ক্ষতি ক্যাট্রো বাহিনী কয়েক মাসেও পূরণ করতে পারবে না। আক্রমণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায় ইতেমধ্যে শুরু হয়ে গেছে, ইউ.এস. যুদ্ধজাহাজের পাহারায় সেই আধ ডজন যুদ্ধজাহাজ রওনা হয়েছে বে অফ পিগ্স এর উদ্দেশ্যে।

এ পর্যায়ে এসে ঘটনাক্রম যেন একটু হোচ্ট খেল। পুমা'র নেতা জোসে ক্রেসপো লক্ষ্য করল বিমানের ইঞ্জিন ঠিকমতো কাজ করছে না। হ্যাপি ভ্যালিতে ফিরে যাবার সময় হাতে নেই বুবাতে পেরে বিমানের নাক স্মৃতিয়ে দিল কী ওয়েস্ট এর দিকে, সকাল ৭:০০টায় বোকাচিকা ন্যাভাল এয়ারস্টেশনে জরুরী অবতরণ করল সে। এ মাঠে সেদিন কী ওয়েস্ট হাইকুলের অলিম্পিক দিবস হবার কথা। ক্রেসপো'র আকস্মিক আগমনে নৌবাহিনী কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়েই জনসাধারণের জন্য এই মাঠ বন্ধ করে দিল, বাতিল হয়ে গেল অলিম্পিক দিবস।

'লিভার অন্যতম সদস্য আলফ্রেডো ক্যাবারেলো'র জুলানীর ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে যায় এই খণ্ডুদে। সময়মতো প্রাণ বাঁচাতে সে ছুটে গেল দক্ষিণে, কোপাইলটসহ অবতরণ করল গ্র্যান্ড কেম্যান দ্বিপে, ফলে সৃষ্টি করল সি.আই.এর জন্য একটা ছেটখাট সমস্যা। কারণ গ্র্যান কেম্যান দ্বিপ ত্রিটিশ সীমানার মধ্যে পড়ে।

সকাল ৮টার সামান্য পরে মিয়ামি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর একটা 'মে-ডে ডিস্ট্রেস সিগন্যাল' পেল এক বি-২৬ বোমার থেকে, ৮:২১টায় জুনিগা এসে অবতরণ করল। কন্ট্রোল টাওয়ারের দৃষ্টিপথে পড়ার আগেই সে বুদ্ধি করে জোড়া ইঞ্জিনের একটাকে বন্ধ করে দিয়েছিল, দেখে মনে হবে খণ্ডুদের ক্ষয়ক্ষতি।

কক্ষপিট থেকে সাদা টি শার্ট আর সুবুজ ট্রাউজার পরে বের হল জুনিগা, সামনে মিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইমিগ্রেশন হেডকোয়ার্টারে সাথে সাথে তোলপাড় উঠল, চারঘণ্টা ধরে চলল 'জিজ্ঞাসাবাদ' সুকোশলে তাকে সরিয়ে রাখা হল সাংবাদিকদের কাছ থেকে। প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করলে কিউবায় অবস্থানরত তার পরিবারের ওপর প্রতিশোধের খাড়া নেমে আসতে পারে, এ অব্যুহাতে নাম পর্যন্ত প্রকাশ করা হল না, অথচ আশ্চর্যজনকভাবে ফটোগ্রাফারদের অনুমতি দেয়া হল এই রহস্যময় পাইলট ও তার বিধ্বনি বি- ২৬ এর ছবি তুলতে। পরদিন সারা দেশে সকল পত্রিকায় ছাপা হল সানগ্লাস চোখে, বেস্বল ক্যাপ মাথায় বোলা গোফের পাইলটের ছবি, তার নীচে কর্তৃপক্ষের হাত দিয়ে প্রকাশিত পাইলটের জবানী,

- পেঞ্জো লুই দিয়াজ লাঙ্গ (কিউবার ভূতপূর্ব বিমানবাহিনী প্রধান) এর ক্ষমতাচ্ছান্তির পর আমরা মোট বারজন পাইলট শেষপর্যন্ত সেখানে ছিলাম। কয়েকমাস ধরে আমরা চারজন মতলব আঁটছিলাম এখান থেকে পালাবার। গত পরশু হঠাত খবর এল আমাদের চারজনের মাঝের একজনকে দেখা গেছে জি-টু প্রধান রামিরো ভালদেজ এর চরের সাথে কথা বলতে ... বাকি তিনজন আলাপ করে দ্রুত সিন্দ্রান্ত নিলাম আদৌ যদি কিছু করতে হয় তো এখনই করা উচিত, কারণ বিশ্বসংঘাতকর্তার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। গতকাল সকালে স্যান অ্যান্টেনানিও দ্যলা বানোস-এ আমার একটা রুটিন ফ্লাইট ছিল। ক্যাম্প লিবার্টেড-এ আরেকজনের দায়িত্ব ছিল স্যান্টিয়াগোতে যাবার। তৃতীয়জনও অলিমিটার ঠিক করার অজুহাতে এ সময় আকাশে থাকার ব্যবস্থা করে ফেলল।

বিশ্বসংঘাতক চতুর্থ পাইলটের ওপর সবারই রাগ ছিল, তাকে শিক্ষা দেবার জন্য আমি স্যান অ্যান্টেনানিও-তে ফিরে গেলাম আমার বি- ২৬টাকে নিয়ে। আর বিমানের ওপর গোলা ফেলে থখন ফিরে আসছি, এক বাঁক গুলি এসে আক্রমণ করল আমার বিমানটাকে। জুলানী ফুরিয়ে আসছে বুরতে পেরে ঝুঁকি নিতে সাহস হল না, আসল গন্তব্যের পরিবর্তে সবচেয়ে কাছে মিয়ামি'কে পেয়ে এখানেই নামার সিন্দ্রান্ত নিলাম।

এ পর্যায়ে সি.আই.এ.'র জন্য আরেকটা বামেলা পাকিয়ে তুলল এক মৃদুভাবী অধ্যাপক, ড. জোসে মিরো কার্ডেনা। কার্ডেনা নিউইয়র্কে স্থাপিত কিউবান বিপ্লবী কাউপিলের সভাপতি। বে অফ পিগ্স এর ঘটনা শুনে মহা উৎসাহে সে ল্যাটিনে এক গালভরা বজ্ঞান দিয়ে বসল। হোটেল লেক্সিংটনে প্রধান কার্যালয় থেকে কিউবার সাধীনতার জন্য এমন বীরত্বব্যঞ্জক আক্রমণের প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ হয়ে উঠল,

ঘটনা আসলে খুব একটা অপ্রত্যাশিত ছিল না আমার কাছে, কারণ আমাদের কাউপিল ঐ দুঃসাহসী পাইলটদের সাথে যোগাযোগ রেখে এসেছিল বরাবর। তাদের এধরনের প্রচেষ্টায় আমরা সবসময়ই উৎসাহ যুগিয়ে এসেছি।

কিউবায় বিমান আক্রমণের প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা পর কী ওয়েস্ট এর বোকাচিকা রয়্যাল ন্যাভাল এয়ারস্টেশনের অধিনায়ক রিয়ার অ্যাডমিরাল রডহ্যাম ম্যাকএলয় ঘোষণা করল,

আজ ভোরে হাতানায় কিউবার বিরণ্দে খণ্ডুদের অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম একটি বি- ২৬ বোমার আমাদের এখানে আবতরণ করেছে।

বিমান আক্রমণে অংশগ্রহণকারী নির্বাসিত পাইলটদের ওপর নির্দেশ ছিল অভিযান শেষে হ্যাপি ভ্যালিতে ফিরে যাবার। কয়েকজন শেষ পর্যন্ত বেঁচে ফিরতে পারবে সে ব্যাপারে পরিকল্পনাকারীদের সন্দেহ থাকলেও এধরনের পরিস্থিতির উন্নত হতে পারে তা তারা আশা করেনি। ম্যাকএলয় এর ঘোষণায় তারা ঘামতে শুরু করে। কারণ যে কাহিনী জুনিগাকে মুখ্যত করান হয়েছিল, বাকি আটজনের ট্রেনিং এ তা ছিল না।

ঐ দিনই বিকেলবেলা জাতিসংঘে কিউবার প্রতিনিধি যুক্তরাষ্ট্রকে বিমান আক্রমণের জন্য প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করল। ডঃ কার্ডোনা'র কথা অনুযায়ী সে যুক্তরাষ্ট্রে বসে কিউবার বিদ্রোহীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছিল, এটাও যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষ নীতির বিরাট লজ্জন। মার্কিন প্রতিনিধি ভেতরের আসল ব্যাপার জানত না, তাকে জানানোও হয়নি। এমন সরাসরি আক্রমণে সে বেশ থত্তমত খেয়ে গেল।

সংবাদপত্রগুলো ব্যাপারটায় গোলমালের গুরু পেল, পরিষ্কার কিছু না জেনে তাই অনেকেই ঝুঁকি নিতে চাইল না। ১৫ তারিখ সকালে এ.পি. সরবরাহকৃত খবরটাই তারা ছেপে দিল সাদামাটাভাবে, কিন্তু প্রভাবশালী পত্রিকা নিউইয়র্ক টাইমস্ এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়, রিপোর্টার ট্যাড শাফ্ট মন্তব্য করল,

কিউবান বিপ্লবী কাউপিল বলছে তারা ঐ পাইলটের পরিকল্পনা আগে থেকেই জানত। তাহলে পাইলট নিজে কেন বলছে তার এ যাত্রা ছিল সম্পূর্ণ আকশ্মিক?

দ্য টাইমস্ ও প্রশ্ন রাখল তাদের রোববারের সংখ্যায়, রহস্যময় পাইলটের ছবি কর্তৃপক্ষ তুলতে দিয়েছে, ছবিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার চেহারা আর বিমানের গায়ে লেখা ১৩৩ নাম্বারটি। ঐ দিন সকালে ঐ নাম্বারের বিমানটিতে রুটিন ফ্লাইট পরিচালনার ভার কার ওপর ছিল, তা কিউবা সরকারের জন্য খুঁজে বের করা কি ছেলেখেলা নয়?

এ লেখা পড়ে বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট কেনেডী প্রচণ্ড ক্ষেপে যায়, কারণ সেখানে এত যত্নে তৈরি পরিকল্পনার ভুলগুলো একদম পর্যায়ক্রমে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। ওয়াশিংটন আর মিয়ামি'র অন্যান্য সাংবাদিকরাও মুখ্য হয়ে ওঠে প্রশ্নে,
দু'জনের (কী ওয়েস্ট এবং মিয়ামী) তো খোঁজ পাওয়া গেল, তবে তৃতীয় পাইলটি কোথায়?

মিয়ামির এক সাংবাদিক জুনিগার বিমানের গায়ে বুলেটের ছিদ্রগুলো পরীক্ষা করেছিল। সে লক্ষ্য করল, বিমানের বোমা ফেলার যন্ত্রপাতিগুলোতে গ্রীজ আর ধুলার আক্রমণ পড়েছে, যুব শিগ্গীরই যে এগুলোর ব্যবহার হয়েছে তা বলা যাবে না কোনমতেই, তাছাড়া বিমানের মেশিনগান থেকে কোন গুলি আদৌ ছোঁড়া হয়েছে বলেও মনে হচ্ছে না। কিউবান পাইলটটির জবানীতে কিন্তু বলা হয়েছিল সে বিশ্বাসঘাতক চতুর্থ পাইলটটির বিমানের ওপর গোলা ফেলে। ক্যান্ট্রোর বিমানবাহিনীর বি-২৬ গুলোর নাক স্বচ্ছ প্লেইগ্যাস দিয়ে তৈরী, আর মেশিনগান বসান থাকে 'উইং-পড' এ। অপরদিকে মিয়ামি বিমানবন্দরে অবতরণকারীটার নাক স্বচ্ছ, আর সেখানে ০.৫০ ক্যালিবারের মেশিনগানটি বসানো।

ঘটনা গড়তে গড়তে শেষে পরিণত হল সরকার ও মুক্ত সাংবাদিকতার সম্মুখ সমরে। নিকারাগুয়া থেকে শনিবার ভোরবাটে রওনা হয়েছিল নয়টি বি- ২৬। আক্রমণের

সময় ধৰ্ষস হয় একটি বিমান, তিনটে অবতরণ করে যথাক্রমে কী ওয়েস্ট, গ্যান্ড কেম্যান এবং মিয়ামিতে। দু'জন পাইলট মারা গেলেও দু'জন কোপাইলটের সহায়তায় বাকী পাঁচটি বিমানই হ্যাপি ভ্যালিতে ফিরে আসতে সমর্থ হয়। সি.আই.এ. হিসাব করে রেখেছিল, বে অফ পিগ্স্ এর বিমানঞ্চাটি দখল করে রাখতে পারলে মঙ্গলবার ১৮ই এপ্রিলের মধ্যে কিউবার ভেতরে নির্বিসিত বি-২৬ এর তৎপরতার কিছু ছবি বের করা যেত। তাহলে এপ্রিলের ১৫ আর ১৭ তারিখের বিমান আক্রমণে অংশগ্রহণকারী বি-২৬গুলো কোথা থেকে রওনা হয়েছে, এ প্রশ্ন থেকে মানুষজনের মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরে যেত। আসল ঝামেলাটা হচ্ছে পাইলটদের কাহিনীটাকে ১৫ তারিখ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে টিকিয়ে রাখা। তারপরে জুনিগার কাহিনী নতুন নতুন খবরের তলায় চাপা পড়ে যাবে। কিন্তু জুনিগার যে কাহিনীর ওপর পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করছিল, তারই এখন নড়বড়ে অবস্থা। এর মধ্যে ১৭ তারিখে দ্বিতীয় বিমান আক্রমণ করা হলে বহির্বিশ্ব কি তাকে কিউবান বিদ্রোহী পাইলটদের কাজ বলে বিশ্বাস করবে? প্রেসিডেন্ট কেনেডী সিদ্ধান্ত নিলেন, না, তারা তা করবে না।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্বে সি.আই.এ.তে ছিল ডেপুটি ডাইস্ট্রে জেনারেল চার্ল্স্ ক্যাবেল ও পরিচালনা বিভাগের রিচার্ড বিসেল। ১৬ই এপ্রিল রোববার রাত ৯:০০টায় জাতীয় নিরপত্তা বিভাগ থেকে তাদেরকে কেনেডীর সিদ্ধান্তের কথা জানান হল। হতভম্ব দু'জন সাথে সাথে ছুটল পুয়ের্টেরিকোতে, স্বরাষ্ট্র সচিব ডীন রাকের কাছে আবেদন করতে। তাদের অনুরোধে সচিব ফোন করল কেনেডী'কে, অনুরোধ করল সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য। কিন্তু গত বছর ইউ-টু গুগুচর বিমানের কেলেক্ষারিতে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার যে শিক্ষা পেয়েছিল, তা কেনেডী ভোলেনি। স্বরাষ্ট্র সচিবের অনুরোধ তাকে নিজ সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারল না। 'বারশ' মাইল দূরে আক্রমণকারীরা ইতোমধ্যে বে অফ পিগ্স্ এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অথচ দ্বিতীয় বিমান আক্রমণটাই না হলে সৈন্যরা সৈকতে নামার সময় প্রতিরোধের জন্য ক্যান্ট্রো'র কাছে যথেষ্ট বিমান থাকবে। বিসেল তখন একটা কাজই করতে পারত, মিড্লবার্গে কেনেডীর কাছে নিজে গিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি বুঝিয়ে রাজী করানো। কিন্তু একটানা গাড়ি চালিয়েও সেখানে পৌছতে মধ্যরাত হয়ে যেত কেনেডী তখনও রাজী না হলে এই সময়ে ডি-ডে থামান তার আয়তের বাইরে চলে যাবে।

রাত ১১টায় বিসেল যোগাযোগ করল হ্যাপি ভ্যালি'র সাথে, কেনেডীর সিদ্ধান্ত শুনে সেখানে বেশ বিশ্বজ্ঞালা দেখা দিল। বিমান আক্রমণের পরিবর্তে ঠিক হল সৈকতে যুদ্ধ জাহাজ থেকে সৈন্য নামার সময় বি-২৬গুলো শুধু মাত্র 'সাপোর্ট' হিসেবে ব্যবহৃত হবে। পরদিন, অর্থাৎ ১৭ তারিখ সোমবার ভোর ৪টায় শেষ চেষ্টা হিসেবে বিসেল সরাসরি ফোনে কথা বলল স্বরাষ্ট্র সচিবের এ্যাপার্টমেন্ট থেকে, বারবার অনুরোধ করল বি-২৬গুলো ব্যবহারে অনুমতি দিতে কিন্তু কেনেডী'র উত্তর তখনও 'না'।

বিমান নিয়ে কথা

বে অফ পিগ্স-এ আক্রমণকারী সৈন্যরা ইতোমধ্যে সৈকতে উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু তাদেরকে রোধ করার জন্য ক্যাট্রো'র তখনও শক্তিশালী বিমানবাহিনী আছে, তারা সৈন্যদের উপস্থিতিতে তুলকালাম কাও ঘটাবে সন্দেহ নেই। হ্যাপি ভ্যালি থেকে মারিও জুনিগা রওনা হয়েছিল আটচল্লিশ ঘটা আগে, মূল পরিকল্পনার নীল নকশা অনুসারে আক্রমণ কেবল শুরু, কিন্তু বাস্তবে তা ইতোমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে।

৪.

যে সময়ের কথা বলছি, ইরানে শাহকে হটিয়ে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছে আয়াতুল্লাহ খোমেনী, মৌলিবাদী বলে ইউরোপের অধিকাংশ দেশের সাথে ইরানের কুটনৈতিক সম্পর্কের খুব খারাপ অবস্থা। এ পর্যায়ে আশির দশকের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র তার ওপর পাঁচ বছরের অন্ত নিষেধাজ্ঞা জারী করল। কোন দেশ ঐ সময়ে তার কাছে যুদ্ধস্তু দূরে থাক, কোন খুচরা যত্নাংশও বিক্রী করতে পারবে না। এতে যদি তার কোন শিক্ষা হয়!

কার্যত দেখা গেল এ ব্যবস্থায় ইরানের কোন অসুবিধাই হচ্ছে না। কোথেকে যে তারা কাজ চালানোর মতো সরবরাহ পাচ্ছে কে জানে! উপরন্তু যখন সে ইরাকের সাথে দীর্ঘকাল ধরে রক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত! এক পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র সন্দেহ করতে লাগল ইসরায়েলকে। যদিও প্যালেস্টাইনীদেরকে কেন্দ্র করে ইসরায়েলের সাথে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ক মোটেও ভাল না, তবু ঠেকায় পড়লে তো মানুষ অনেক কিছুই করে। ইসরায়েলকে এর আগেও সন্দেহ করা হয়েছিল অবৈধ অন্তরের চালানদার হিসেবে, তাতে সে 'হ্যাঁ' ও বলেনি, 'না' ও বলেনি। তার পেছনে বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সমর্থন রয়েছে, প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ হাতে না থাকায় তাই সে পার পেয়ে এসেছে বরাবরই।

অবশ্যে ১৯৮৪'র শেষভাগে এক ইরানী পাইলট মার্কিন এফ-ফোর ফ্যান্টম ফাইটার চালিয়ে ইরান থেকে সৌদি আরবে পালিয়ে এলে সব রহস্যের সমাধান হল। সৌদি বিশেষজ্ঞরা মহা উৎসাহে ঐ বিমানের পোষ্ট মটরে করল। কিছু অতি প্রয়োজনীয় ও জটিল যন্ত্রপাতির নম্বর ধরে খুঁজতে খুঁজতে দেখা গেল কেঁচো খুড়তে সাপ বেরিয়েছে। ঐ যন্ত্রাংশের একটা বিরাট অংশ প্রক্রতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র নিজেই ইসরায়েলের কাছে বিক্রয় করেছিল। আর বাকীগুলোর যোগানদার হচ্ছে গ্রীস এবং অন্যান্য 'ন্যাটো' জোটভূক্ত দেশসমূহ।

অন্তর্ঘাত

পৃথিবীর প্রতিটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের রয়েছে নিজস্ব আকাশসীমা, তাতে অনাহুত কোন বিমান প্রবেশ করলে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে নিজ স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্র তাকে ধ্বংস করে দেবার ক্ষমতা রাখে তবে আইনে এও উল্লেখ আছে, বিমানটিকে কোনরকম সতর্ক করা ছাড়াই দূম করে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। কতগুলো পর্যায়ক্রমিক নিয়মে তাকে প্রথমে সাবধান করতে হবে, তাতে যদি কাজ না হয়, তবে ঐ বিমানের ভাগ্য নির্ধারণের স্বাধীনতা ঐ রাষ্ট্রের রয়েছে।

এভিয়েশনের নিয়মানুযায়ী কোন বিমান বেআইনীভাবে কোন দেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন করলে সাথে সাথে আকাশে উড়ে যায় সদা প্রস্তুত পাহারাদার বিমান। অনাহুতকে আকাশের ভাষা ইংরেজিতে বেতার সংকেত পাঠানো হয়, কিংবা হাত দিয়ে ইঙ্গিতে নির্দেশ দেয়া হয় তাকে বের হয়ে যাবার অথবা মাটিতে অবতরণ করার। এতে কাজ না হলে পাহারাদার অনাহুতের সামনে বাঁদিকে উড়ে গিয়ে অবস্থান নেয়, ডানা নেড়ে সংকেত পাঠায়, 'আমাকে অনুসরণ কর'। অপরজন একইভাবে ডানা নাড়লে বোঝা যাবে, তোমার নির্দেশ আমি মেনে নিছি। আর রাতের আঁধারে হলে ডানার আলো জ্বলে নিভে সংকেত আদান প্রদান করা হয়। তারপর তাকে নিকটতম বিমানবন্দে অবতরণ করানো হবে। এতো আয়োজনের পরেও যদি সে নির্দেশ না মানে, তবে ঐ পাহারাদারের ক্ষমতা রয়েছে বিমানটিকে ধ্বংস করে দেয়ার।

এই কঠিন নিয়ম করা হয়েছে অথবা নয়। দুই পরাশক্তির মাঝে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সময় বিমান নিয়ে ছেটখাট গোলমাল লেগেই থাকত। যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতীরে আকাশসীমা তিন নটিক্যাল মাইল আর প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের বারো নটিক্যাল মাইল। তাদের কাজ কর্মে অবশ্য এ আকাশসীমার প্রতি শুন্দার কোন নির্দেশন দেখা যায় না। কিউবা যাবার পথে সেভিয়েত বিমান আটলাটিকের তীরে যুক্তরাষ্ট্রের সীমানার ভেতরে অ্যাদিজের ওপর চক্র দেয়া একটা অভ্যাসে পরিগত করেছিল। এক হিসাবে দেখা যায়, ১৯৮৩'র জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই নয় মাসে যুক্তরাষ্ট্রের

বিমান নিয়ে কথা

আকাশসীমায় অনাহত রাশিয়ান বিমানের সংখ্যা ছিল সাতাত্ত্ব। তাদের প্রত্যেকেই উদ্দেশ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রের রাডার ফ্রিকোয়েন্সি ধারণ করা, আর হিসাব করে দেখা রাডারে ধরা পড়ার পরমুহূর্ত থেকে আকাশে পাহারাদার বিমানের আবির্ভাব পর্যন্ত সর্বনিম্ন কতৃতুক সময় হাতে পাওয়া যায়। অবশ্য মার্কিন বিমানগুলোও কম যায় না। তারা সোভিয়েত আকাশসীমা লজ্জন করে নয়শ' বারেরও বেশি আর প্রতিবারই কিছু রাশিয়ান ফ্রাউন্ট টু এয়ার মিসাইল ধ্বংস করে নিরাপদে ফিরে আসে।

আজকাল শুধুমাত্র যুদ্ধবিমান বা গুপ্তচর বিমানই নয়, নিরীহ যাত্রীবাহী বিমানও ব্যবহৃত হচ্ছে গুপ্তচরবৃত্তিতে। ১৯৮১ সালে মিলিটারি ক্র্যাকডাউনের পরপরই বিমান সংস্থা 'এরোফ্লেট' এর বিমানকে যুক্তরাষ্ট্র ওয়াশিংটনে নামার অনুমতি বাতিল করে দেয়। দু'টি এরোফ্লেট বিমান নিউ ইংল্যান্ড সামরিক ঘাঁটি এবং এটনে ইউ.এস. নেভী শিপইয়ার্ডের ওপর দিয়ে নিজ গতিপথের বাইরে উড়ে গেলে যুক্তরাষ্ট্র এ ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়। এটনের শিপইয়ার্ডে তখন এক নতুন ধরনের নিউক্লিয়ার সাবমেরিন তৈরির কাজ চলছিল। বিমান দু'টোই ছিল যাত্রীবাহী, অথচ এমন কোন যান্ত্রিক গোলযোগ বা খারাপ আবহাওয়ার আভাস পাওয়া যায়নি যা তাদের এমন আচরণের ব্যাখ্যা দেয়।

আকাশসীমা নিয়ে এত কড়াকড়ি করার পরেও নিরীহ যাত্রীবাহী বিমানের ওপর নৃশংস আক্রমণের সংখ্যা বিরল নয়। ১৯৭৮ সালে কোরিয়ান এয়ারলাইনের ফ্লাইট নং ৯০২, 'একশ' দশজন যাত্রী ও ক্রুসহ প্যারিস থেকে সিউল যাচ্ছিল রুটিন ফ্লাইটে। দিক নির্ধারণ যত্নে গোলমাল দেখা দিলে আকর্টিক বলয়ের ওপরে পাইলট বাধ্য হয় বিমানের নাক ১৮০ ঘুরিয়ে সোভিয়েত আকাশসীমায় প্রবেশ করতে। ধরা পড়ার আগে দু'ঘন্টা ধরে তা স্ট্র্যাটেজিক সাবমেরিন ও বোঝার গবেষণা এলাকার ওপর দিয়ে উড়েছিল।

তারপরের ঘটনা কিছুটা গোলমেলে। সোভিয়েত ভাষ্য অনুযায়ী, ভূমিতে অবতরণ করার জন্য তারা বিমানটিকে সংকেত পাঠিয়েছিল, দু'টো ফাইটার পাহারাদার বিমানের মাধ্যমে। কিন্তু সে নির্দেশ নাকি অস্থায় করা হয়। জেট এয়ারলাইনের কোপাইলট একথা অস্থীকার করে, বলে যে তাদেরকে কোন সংকেত পাঠান হয়নি। আসলে কি ঘটেছিল তা সঠিক বোঝার উপায় নেই, কিন্তু এক পর্যায়ে ফাইটার থেকে দু'টো মিসাইল ছোড়া হয়, ঐ জেটবিমান সাধারণ যাত্রীবাহী জানা সত্ত্বেও। একটা মিসাইল এসে আঘাত করল ইঞ্জিনে সাথে সাথে ফিউসিলেজ গর্ত হয়ে গেল। দু'জন যাত্রীর তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটল, আহত হল ১৩ জন। বিমান বিপদ্জনকভাবে উচ্চতা হারাল, ৩৫,০০০ ফুট থেকে নেমে এল ৩,০০০ ফুটে, ৩৫ মিনিট পরে ক্র্যাশল্যান্ড করে বরফে ঢাকাহুদের ওপর।

এঘটনার জন্য সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ কোন দুঃখতো প্রকাশ করলই না, বরং যাত্রীদের উদ্ধার কাজ, হ্রদ থেকে লোকালয়ে পৌছে দেয়া খাদ্য আর তিনদিনের থাকার খরচ

বিমান নিয়ে কথা

বাবদ এক লাখ ডলারের একটা বিল দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের হাতে ধরিয়ে দিল। যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ যাত্রীটি সোভিয়েত হেফাজতে ছিল, কোরিয়া সরকার এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করেনি। যাত্রীরা সকলে নিরাপদে দেশে এসে পৌছা মাত্র সে বিল পরিশোধ করতে অস্বীকার করল। কখনোই আর সেই লাখ ডলারের বিল মেটান হয়নি।

২.

১৯৭৩ সাল, ইসরায়েল সরকার ক'দিন ধরে খুব দুর্চিতার মাঝে রয়েছে। গুজব রটেছে, আরব সন্ত্রাসীরা সাধারণ যাত্রীবাহী বিমানের ছাব্ববেশে আঘাতী আঘাত হানবে ইসরায়েলের এক শহরের ওপর। ইসরায়েল অধিকৃত সিনাই মরুভূমি সেসময়ে সরকারিভাবে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। এ মরুভূমিতে ধুলিবাড় নিয়ন্ত্রিতিক ব্যাপার, হঠাতে তা ওঠে, চারদিক ধুলায় আঁধার করে দিয়ে আবার হঠাতে তা নেমে যায়। দুর্ভাগ্যবশত এমন একটা ধুলিবাড়ের কবলে পড়ে কায়রোগামী এক লিবিয়ান ৭২৭ বিমান নিজেদের অজাতে ইসরায়েল অধিকৃত মরুভূমির অংশে এসে পড়ল।

ইসরায়েল বিমানবন্দর গুজবের কারণে আগে থেকেই উত্তেজিত অবস্থায় ছিল, অনাহত বিমানের উপস্থিতি তাকে বিচলিত করল, সাথে সাথে আকাশে উড়াল দিল এফ ফোর-ই পাহারাদার বিমান। তারা ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে বিমানটাকে নির্দেশ দিল কাছের সামরিক ঘাঁটিতে অবতরণ করার জন্য। যাত্রীবাহী বিমানটির ক্রেত্ব পাইলট দুর্ভাগ্যবশত তাদের সংকেতের অর্থ বুঝতে পারল না। সে ভাবল, এই ধুলিবাড়ে পথ দেখানোর জন্য বন্ধুভাবাপন্ন মিনার এসকর্ট হিসেবে ঐ ফ্যান্টম বিমান পাঠিয়েছে।

সতর্কীকরণ উপেক্ষা করতে দেখে ফ্যান্টমচালক যাত্রীবাহী বিমানটিকে আরব সন্ত্রাসীদের বলেই ধরে নিল, সাথে সাথে তাকে ভূপাতিত করল মিসাইলের আঘাতে। ১১৬ জন যাত্রীর মাঝে ১০৮ জনেরই তৎক্ষণাত্মক মৃত্যু ঘটল।

দুর্ঘটনার পর বিমানের ধ্বংসাবশেষ থেকে টেনে বের করা হল কক্ষপিটে কর্মরতদের রেকর্ড করা আলাপচারিতা, তা থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ল দুই বিমানের পাইলটের মাঝে ভুল বোঝাবুঝিটা। গোলমাল কোথায় বুঝতে পেরে ইসরায়েল সরকার তখন আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করল লিবিয়া সরকারের কাছে, আর ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিন মিলিয়ন ডলারেরও বেশি প্রদান করল নিহতদের পরিবারের কাছে।

৩.

এবার অফিকা মহাদেশের এক সদস্য জিবাবুয়ে'র কাহিনী। যে সময়ের কথা বলছি, দক্ষিণ আফিকার মত সেখানে সাদা কালো মানুষের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছে। সাদা মানুষের প্রাধান্যে গঠিত প্রধানমন্ত্রী রবার্ট মুগাবে এর সরকার ক্ষমতাসীন, তার প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী কালো চামড়ার মানুষ জোশুয়া কোমো। কথায় বলে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে, উলুখাগড়ার দল মরে। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর নেতৃত্বে সংঘটিত গৃহযুদ্ধের মাঝে পড়ে সাধারণ মানুষ যে ন্যূনসত্তার শিকার হয় তারই কিছু খণ্ডিত তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

জোশুয়া কোমো তার গেরিলা বাহিনী 'প্যাট্রিওটিক ফ্রন্ট আর্ম' নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল মুগাবে'র সরকারি বাহিনীর সাথে দীর্ঘদিন ধরে। ১৯৭৮ সালে গৃহযুদ্ধ চলাকলীন সময় একবার কোমো'র পদাতিক বাহিনীর রাডারে ধরা পড়ল 'এয়ার রোডেশিয়া'র এক যাত্রীবাহী ভিসকাউন্ট, বিমানটি স্যালিসবুরি থেকে ১৭৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে কারিবা বিমানবন্দরে যাচ্ছিল। জিবাবুয়ের প্রাচীন নাম ছিল রোডেশিয়া যা অনুসরণ করে এর বিমান সংস্থার নাম রাখা হয় 'এয়ার রোডেশিয়া'।

রাডারে ভিসকাউন্ট ধরা পড়লে প্যাট্রিওটিক ফোর্স সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মাথায় তাকে লক্ষ্য করে সোভিয়েত এস.এস. ৭ ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ল, ওটা নিরীহ যাত্রীবাহী বিমান জানা সম্ভেদ। ভূপাতিত বিমানের ৫৬ জন যাত্রীর মাঝে ৩৮ জন মারা গেল সাথে সাথে। ধ্বংসবাশে এর তলা থেকে বাদবাকি আহত যাত্রীরা যখন হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসছিল, আন্তর্ধারী গেরিলারা সেখানে এসে উপস্থিত হল, তারপর নিবিচারে গুলি চালিয়ে দিল তাদের ওপর। এভাবে মৃত্যু ঘটল আরও দশজনের। কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপের মুখে ফেলার জন্যই নাকি তারা এ কাজটা করেছিল।

পরের বছর গেরিলাবাহিনীর কাছে গোপনসূত্রে খবর এল রোডেশিয়ান প্রতিরক্ষা প্রধান পিটার ওয়াল্স একটা ভিসকাউন্টের ফ্লাইটে থাকবে। এমন সুযোগ কোমো লুকে নিল, ফ্লাইটের সময় গতিপথ ভিসকাউন্টের নম্বর প্রত্বিত সহজেই যোগাড় হয়ে গেল। রানওয়ে থেকে উড়ে যাবার কয়েক ঘন্টার মাথায় এই ভিসকাউন্টকে আঘাত হানল গেরিলাদের ছোঁড়া রকেট, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটল বিমানের অভ্যন্তরে ৫৯ জন যাত্রী ও ক্রু'র। এতবড় ন্যূনস ঘটনার ফলাফলস্বরূপ জোশুয়া কোমো একটা কারণেই সামান্য আক্ষেপ করে, আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য প্রতিরক্ষা প্রধান আসলে এই ফ্লাইটে উপস্থিত ছিল না।

৮.

এ অধ্যায় শুরু করেছিলাম সোভিয়েতদের যাত্রীবাহী বিমান ধ্বংসের ঘটনা নিয়ে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি কোন নতুন কিছু নয় তাদের জন্য, কারণ মাত্র পাঁচ বছর পরেই তারা আরেকটি কোরিয়ান যাত্রীবাহী বিমান ভূপাতিত করে।

১৯৮৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর, টোকিওতে কর্মরত টেকনিশিয়ান ও ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তারা নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না, অথচ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সঙ্গিত ঐ কামরায় যোগাযোগ ব্যবস্থার চরম উৎকর্ষের নির্দশনগুলো যা নির্দেশ করছে, তাতে যেকোন সুস্থ বুদ্ধির মানুষের হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসার কথা। কোরিয়ান এয়ারলাইনের একটা বোয়িং ৭৪৭, ফ্লাইট নং ০০৭ তার ২৬৯ জন যাত্রীসহ সোভিয়েত মিসাইলের আঘাতে আকাশেই ধ্বংস হয়ে গেছে, রাডারের কালো পর্দা থেকে তার অস্তিত্ব নির্দেশক উজ্জ্ল লাল বিন্দুটা অদৃশ্য হয়েছে চিরতরে।

ব্যাপারটা আঘাত হতেই তারা যোগাযোগ করল ওয়াশিংটনের সাথে। জরুরী বার্তা পেয়ে প্রেসিডেন্ট রেনাল্ড রিগ্যান ক্যালিফোর্নিয়ার ছুটি বাতিল করে ছুটে এল ওভ্যাল অফিসে, বিস্তারিত শুনে সোভিয়েতদের নির্বুদ্ধিতায় ফেটে পড়ল রাগে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথালিন দ্বিপের কাছে ধ্বংস করা বিমানটি যুক্তরাষ্ট্রের নয়, কিন্তু আমেরিকানদের কাছে তাতে ব্যাপারটা কোনমতই হালকা নয়। কারণ ফ্লাইট ০০৭ রওনা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডী এয়ারপোর্ট থেকে, আর তাতে একজন কংগ্রেস সদস্যসহ ৬১ জন ছিল আমেরিকান।

সারা বিশ্বে দ্রুত এর প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ল। কমপক্ষে চারটি পশ্চিম ইউরোপীয় সরকার সোভিয়েত ডিপ্লোম্যাটদের ডেকে এনে কঠিন বাক্যবর্ঘণ করল। ইটালীর বিশাল কমিউনিস্ট পার্টি মঙ্কোর কাছে তার অপরাধের জবাবদিহি দাবী করে বসল, তাদের সাথে সুর মেলাল জাপানের কমিউনিস্ট পার্টি। সিউলে প্রেসিডেন্ট চুন ডু হ্যান সোভিয়েত আচরণের প্রতিবাদ করল, হাজার হাজার মানুষের প্রতিবাদ মিছিলে মুখর হয়ে উঠল দক্ষিণ কোরিয়ার রাস্তা। একই ধরনের ছোটখাট মিছিল বের হল যুক্তরাষ্ট্রেও, নিউইয়র্কে জাতিসংঘ অফিসের সামনে প্রতিবাদ মুখর কোরিয়ানরা সোভিয়েত পতাকা পুড়িয়ে দিল।

বিশ্বব্যাপী তীব্র প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়ে দুর্ঘটনার দু'দিন পর সোভিয়েত সংবাদ সংস্থা 'তাস' খবর দিল যে হ্যাঁ, দু'দিন আগে একটা 'অজ্ঞাত পরিচয়হীন বিমান' ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের আকাশসীমা লজ্জন করে। সাবধান করার জন্য তারা ফাঁকা গুলি আর ট্রেসার শেল ছুঁড়েছিল ঠিকই, কিন্তু সম্পূর্ণ বিমান ধ্বংস ! অসম্ভব ! এমন কোন

বিমান নিয়ে কথা

কাজ তারা করতেই পারে না। তাছাড়া ঐ বিমান সোভিয়েত আকাশসীমানার অনেক ভেতরে চুকে গুগচরাগিরি করছিল, এধরনের একটা ইঙ্গিত করতেও 'তাস' পিছপা হল না। প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল ফ্লাইট ০০৭ ও তার যাত্রীদের জীবনের শেষ কয়েকটি ঘন্টায়? তদন্ত কর্মিটি তাদের কাজ শুরু করল ফ্লাইট ০০৭ এর যাত্রাস্থল কেনেডী এয়ারপোর্ট থেকে।

নিউইয়র্ক শহরের জন এফ কেনেডী বিমানবন্দর, মঙ্গলবার স্থানীয় সময় রাত ১১:৫০-এ পনের নব্বর গেট থেকে রওনা হবার কথা ছিল কোরিয়ান এয়ারলাইনের ফ্লাইট ০০৭ এর। টেক্ অফের সময় দেখা গেল সে পঁয়ত্রিশ মিনিট দেরী করে ফেলেছে। তার গত্ব্যস্থল সিউল, তবে যাত্রীদের মাঝে ১৩০ জনের গত্ব্যই আরো দূরে, হংকং, টেকিও, তাইওয়ান প্রভৃতি শহর। কোরিয়ান এয়ারলাইনে এশিয়া ভ্রমনের জন্য অন্যতম সর্বনিম্ন ভাড়া নেয়া হয় বলেই তারা ফ্লাইট ০০৭ এ চেপেছে।

আলাক্ষণ অ্যাক্ষোরেজ শহরে যাত্রাবিত্তি হবার কথা ছিল ৯০মিনিটের, সেখানকার স্থানীয় সময় রাত আড়াইটায় ফ্লাইট ০০৭ সেখানে অবতরণ করল। ঘুম ঘুম চোখে যাত্রীরা বোয়িং ৭৪৭ থেকে নেমে এল, হাত পা নেড়ে গরম হতে লাগল, কেউ কক্ষ থেতে খেতে গল্প জুড়ে দিল সহযাত্রীদের সাথে। এই ফাঁকে বিমানবন্দরের কমীরা বোয়িংটাকে ঝোড়ে মুছে পরিষ্কার করল, ট্যাংকে জ্বালনী ভরা হল ৩৭,৭৫০ গ্যালন, স্বাভাবিক যাত্রাপথে ৬,০০০ মাইলের জন্য এ জ্বালনী যথেষ্ট। এবারে ক্যাপ্টেন চুন বিয়াং ইন এর অধীনে নতুন একদল ত্রুং এল। ক্যাপ্টেন চুন অত্যন্ত দক্ষ পাইলট, অতীতে ১০,৫৪৭ ঘন্টা বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা তার আছে। অ্যাক্ষোরেজ এ এক সৌভাগ্যবান পরিবার নেমে যায় বিমান থেকে। আলাক্ষণ ফ্রেইঞ্চ চালক রবার্ট সিয়ার্স সপরিবারে ছুটি কাটাতে গিয়েছিল নিউইয়র্ক, ছুটি শেষে ফ্লাইট ০০৭য়ে কর্মসূলে ফিরে আসে।

কফি পানরত যাত্রীদের সামনে তাদের বিমানের সিস্টার জেট ৭৪৭, ফ্লাইট ০১৫ এসে অবতরণ করল। সেটাও সিউলগামী, ফ্লাইট ০০৭ এর ঠিক বিশ মিনিটের পথ পেছনে থাকবে। তার যাত্রীরা অনেকেই এসে কফিপানরতদের সাথে গল্প যোগ দিল। কারো মাঝে কেন তাড়াহড়ো নেই, কারণ কোরিয়ায় কিস্পো বিমানবন্দর ভোর ছটার আগে খুলবে না, আর কোরিয়ায় ভোর ছটা মানে এ্যাক্ষোরেজে বিকেল পাঁচটা।

ফ্লাইট ০১৫ এ ছিল সিউল কনফারেন্সগামী ৬জন মার্কিন কংগ্রেস সদস্য নিয়ে গঠিত দলের ৫ জন সদস্য। ক্যারেলিনার সিনেটর জেসে হেম্স ইডাহো'র সিনেটর স্টীভ সিম্সকে সাথে করে নামল বিমান থেকে, উদ্দেশ্য হল দলের ষষ্ঠ সদস্য জর্জিয়ার সিনেটর লরেন্স ম্যাকডোনাল্ডকে খুঁজে বের করা। তারা জানত সিউল কনফারেন্সের অন্যতম বক্তা ম্যাকডোনাল্ড ফ্লাইট ০০৭- এ ভ্রমণ করছে। স্ফূর্তি রোমস্থল করতে গিয়ে সিম্স পরে বলে,

বিমান নিয়ে কথা

বিমানে ঘুমানোটা ল্যারির (লরেন্স ম্যাকডোনাল্ড) কাছে কোন ব্যাপারই না। আসনে বসেই ও দিব্যি কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়ে নিতে পারে। যাত্রাবিত্তির সময় হয়ত সেজন্যই বিমান থেকে আর নামেনি, আর আমরা তাকে খুঁজেও পাইনি। হয়ত দেখা হলে রাজী করাতাম আমাদের বিমানে যাবার জন্য, অথবা ও রাজী করাতো আমাদেরকে তার বিমানে একসাথে ভ্রমণের জন্য।

কেন্টাকির সিনেটর ক্যারল হার্বার্টের কথা ছিল ম্যাকডোনাল্ডের সাথে ফ্লাইট ০০৭য়ে যাবার, কিন্তু সেখানকার এক আলোচনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাজী হওয়ায় শেষ মুহূর্তে সে রিজার্ভেশন বাতিল করে দেয়। ম্যাকডোনাল্ড নিজেও আসলে বুক করেছিল রোববারের ফ্লাইট ০০৭। কানেকটিকাটের বিমানে ঢেড়ে আটলাটায় আসার পথে নিউইয়র্কের বাড়ের জন্য তাকে পথ পরিবর্তন করতে হয়। সিউলগামী প্যান অ্যাম ফ্লাইট ধরার সময় ছিল হাতে, তবে কোরিয়ান এয়ারলাইনের ভাড়া কম হওয়ায় সে মঙ্গলবারের ফ্লাইট ০০৭ ধরে।

ফ্লাইট ০০৭ সিউল যাছিল যে পথে তা এভিয়েশনের খাতায় 'রেড রুট টুয়েন্টি' নামে পরিচিত। টেকিও আর সিউল যাবার জন্য এটাই সবচেয়ে উত্তরের সরাসরি পথ। এতে কুরিল দ্বীপমালার ৩০ মাইল দূরে সোভিয়েত কামচাটকা উপদ্বিপের পাশ যেঁমে যেতে হয়। কামচাটকায় মিসাইল পরীক্ষণ ও দ্রুত রাডার বার্তা প্রেরণের গবেষণাগার অবস্থিত, এখানকার আকাশসীমা লজ্জন করলে সোভিয়েতদের অধিকার আছে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার। তবু কৃতিম উপগ্রহ সূক্ষ্মভাবে জরীপ না করে সে এলাকার মানচিত্র তৈরি করেছে। সেখানে মেঘাছ্ছন্ন আবহাওয়া ভোরের আবছা আলোতে মাটি থেকে ছয় মাইল উর্ধ্বে বসে ক্যাপ্টেন চুন এর অভিজ্ঞ চোখ নিজেদের সঠিক অবস্থান নির্ণয়ে ব্যর্থ হলে খুব একটা দোষ দেয়া যায় কি?

ফ্লাইট ০০৭, বোয়িং ৭৪৭ টেকিও'র এয়ার কন্ট্রোলারদেরকে নিজেদের অবস্থান নির্দেশ করল হোকাইডো থেকে ১১৫ মাইল দক্ষিণে, অথচ রাডারে এ অবস্থানে কোন আলোকিত বিন্দু দেখা গেল না। বোয়িংটার অবস্থান নির্দেশনাতে বিন্দু যেখানে দেখা গেল তা হোকাইডো থেকে ১১৫ মাইল দূরে ঠিকই, কিন্তু দক্ষিণে নয়, উত্তরে, সোভিয়েত আকাশসীমার ভেতরে। জাপানে তখন বাজে ভোর ৩:২৬টা। কন্ট্রোলারদের কাছে ব্যাপারটা আরও ঘোলাটে হয়ে উঠল যখন রাডারে ২য় একটি আলোকবিন্দু দেখা গেল যা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে প্রথমটির দিকে। ভোর ৩:২৭ টায় বোয়িং ৭৪৭ থেকে বিপদ সংকেত ভোসে এল,

কোরিয়ান এয়ার - ০০৭ , বাক্য শেষ হল না, মাইক্রোফোন মুখরিত হয়ে উঠল অর্থহীন শব্দে, এর ঠিক ১২মিনিট পরে রাডার থেকে প্রথম আলোকবিন্দুটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিমান নিয়ে কথা

সিউলের কিস্পো এয়ারপোর্টে ফ্লাইট ০০৭ এর যাত্রীদের অপেক্ষমান আঘীয় দ্বজন ও বদ্ধু বাক্সবদের মাঝে নানা গুজব ছড়িয়ে পড়ল। কেউ বলল বেয়িংটাকে ছিনতাই করা হয়েছে, কেউ বলল, না, ওটা রাশিয়ার ঘাটিতে অবতরণ করতে বাধ্য হয়েছে। কোরিয়ান এয়ারলাইনের এক মুখ্যপাত্র টার্মিনালে অপেক্ষমান শক্তিকত জনতাকে জানাল, বেয়িংটা নিরাপদে সাখালিন এ অবতরণ করেছে, সবাই তাদের টেলিফোন নাথৰ রেখে গেলে সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাদের সাথে যোগাযোগ করা হবে। দ্বন্দ্বের নিষ্পাস ফেলে অপেক্ষমান জনতা বিমানবন্দর ছেড়ে গেল। কিন্তু ১৩ ঘন্টা পরে তারা মুখ্যমুখ্য হল কঠিন বাস্তবের, যখন ওয়াশিংটন থেকে স্বরাষ্ট্র সচিব জর্জ শাল্টজ জানাল বিশ্ববাসীকে ফ্লাইট ০০৭ ও তার ২৬৯ জন যাত্রীর শেষ পরিণতির কথা।

এভিয়েশনের ইতিহাসে এটা পঞ্চম বৃহত্তম মৃত্যু সংখ্যা, আর মার্কিন ইতিহাসে নিরন্তর মানুষের ওপর সামরিক আক্রমণে পার্ল হারবারের পর এটাই প্রথম পুনরাবৃত্তি। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ তখনও ঘটনার দায়িত্ব অঙ্গীকার করে যাচ্ছিল, কিন্তু তারা জানতানা বেয়িংটাকে যখন তারা লক্ষ্য করছিল, তখন তাদের ওপরেও লক্ষ্য রাখছিল মার্কিন ও জাপানী কৃত্রিম উপগ্রহ। হোকাইডোর উত্তরাঞ্চলে ওয়াকানাইতে স্থাপিত জাপানী প্রতিরক্ষা সংস্থার বিশাল রাডার ইন্স্টলেশনে ধরা পড়ে সোভিয়েত এক পাইলট ও ভূমিতে তার উর্ধ্বর্তনের মাঝে দুঘটনার সময়কার কথোপকথন। আর সব বেতারবার্তার মতো স্বাভাবিকভাবেই তা রেকর্ড হয়ে যায়, কিন্তু বিমান দুঘটনার আসল কারণ খুঁজতে গিয়ে ঐ রেকর্ড বাজানো হলে কথাবার্তার গুড় অর্থ বের হয়ে পড়ে।

কম্যান্ডার : 'লক্ষ্য স্থির করে তাক কর,'

পাইলট : 'তাক করা হয়েছে,'

কম্যান্ডার : 'ফায়ার!'

পাইলট : 'ফায়ার করা হয়েছে'

সামান্য পরেই প্রশ্ন এল

- কি ব্যাপার? ওটা কোথায় গেল?
- আমরা ওটাকে ভূপাতিত করেছি।

এ প্রমাণের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের আর দায়িত্ব অঙ্গীকার করার উপায় রইল না। আন্তর্জাতিক আইনে অভিজ্ঞরা বলেছিল মৃতদের আঘীয়রা সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে, তবে সে দাবি কর্তৃপক্ষ আদৌ মেটাবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিশ্বের ১৩টি জাতির নিরীহ নিরন্তর ২৬৯ জনের এমন মর্মান্তিক মৃত্যু যারা এক মুহূর্তের সিন্দিকে ডেকে আনতে পারে, তাদের কাছে ক্ষতিপূরণের আশা করা বৃথা।

বিমান ছিনতাই

১.

১৯৮৩ সালের মে মাসে এক রৌদ্রেজ্জুল দিন, দক্ষিণ কোরিয়ায় সেদিন শিশুদিবস পালন করা হচ্ছে। চারদিকে উৎসবের আমেজ, ছেট শিশুরা উজ্জ্বল বর্ণের কাগজের ফেন্টন নিয়ে ছুটোছুটি করছে। হাঠার্ষ বিমান হামলার তীক্ষ্ণ সাইরেন বেজে উঠল। দু'মিনিট পরে অবশ্য তা থেমে গেল, তবে কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ল না, সিউলের ৪০ মাইল পূর্বে মার্কিন ধাঁটি ক্যাম্প পেজ' ছাড়া। কোথা থেকে এক বিদ্যুটো রঙের বিমান এসে অবতরণ করল সেখানে, রানওয়ের শেষ সীমা নির্দেশক বেড়াটার গায়ে প্রায় নাক লাগিয়ে। বিমানের লেজে গণগানের পাঁচ তারকার লাল পতাকা আঁকা। বিমানটাকে শিগ্নীরই সন্তান করা গেল বৃটেনে তৈরী তিন ইঞ্জিনের ট্রাইডেক্ট জেট হিসেবে, চীনের রাষ্ট্রীয় বিমান সি.এ.এ. সি. ওটার মালিক। শেনহাইয়াং থেকে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে তা সাংহাই যাচ্ছিল, সাথে ৯৬ জন যাত্রী ও ৯ জন ত্রু। পথে ৬ জন সশস্ত্র চাইনেজ বিমানটাকে ছিনতাই করে নির্দেশ দেয় তাদেরকে তাইওয়ানে নিয়ে যাবার।

মাও সে তুং এর কমিউনিস্ট পার্টি চ্যাং কাই শেক এর কুয়োমিন্টং দলকে অন্তর্বলে চীন থেকে তাইওয়ানে তাড়িয়ে দেবার পর এ দু'দেশের পরম্পরিক সম্পর্ক কখনোই উষ্ণ ছিল না। চীনের বিশাল আয়তন ও জনশক্তির কাছে তাইওয়ান নেহায়েতই শিশু বলে কোনদিন মুখ ফুটে কিছু বলার সাহস পায়নি। ছেটখাট কিছু ঘটনা অবশ্য দু'দেশের তিক্র সম্পর্কের বহিপ্রকাশ হিসেবে মাঝেমাঝেই ঘটে যায়। '৮২ এর অক্টোবরে এভাবেই এক চীন বিমানবাহিনীর পাইলট তার মিগ ২৯ জেট ফাইটার চালিয়ে গণতান্ত্রিক দক্ষিণ কোরিয়ায় এসে অবতরণ করেছিল। সেবার তাকে মহাসমারোহে তাইওয়ানে পাঠিয়ে দেয়া হয়, তাইওয়ান তাকে বীরের মর্যাদায় গ্রহণ করে।

কিন্তু এবারের ছিনতাইকারীদের ভাগ্য মোটেও সুপ্রসন্ন নয়। তারা সরাসরি তাইওয়ানে যেতে চেয়েছিল। বিমান চালক চালাকি করে পথ পরিবর্তন করে, উদ্দেশ্যে ছিল

বিমান নিয়ে কথা

কমিউনিস্ট উত্তর কোরিয়ার পিয়ং ইয়ং এ নামবে। শেষমুহূর্তে ছিনতাইকারীরা তার উদ্দেশ্য টের পেয়ে গেল, দ্রুত কোন উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে তাকে বাধ্য করল আরও দক্ষিণে যেতে। দক্ষিণ কোরিয়ার আকাশসীমা লঙ্ঘন করলে পাহারাদার ফাইটার বিমান এসে তাদেরকে নির্দেশ দিল ভূমিতে অবতরণ করার জন্য।

মাটিতে নেমেই ছিনতাইকারীরা দাবি করল তাইওয়ানের প্রতিনিধি দলের সাথে দেখা করার জন্য, কিন্তু পরিস্থিতি এতটা সহজ আর নেই। সশস্ত্র সৈনিক দ্রুত জেটটাকে ঘিরে ফেলল, ভেতরে খাবার পাঠানো হল, গুলিতে আহত দু'জন কু'কে পাঠিয়ে দেয়া হল হাসপাতালে, তবে তাইওয়ানের প্রতিনিধি দলের কোন খবরই পেল না ছিনতাইকারীরা। পিকিং এই বিমান ছিনতাই এবং সশস্ত্র গওগোলের ব্যাপারে সরাসরি কথা বলতে চাইল সিউলের সাথে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব রাজনীতির নানা উৎসান পতনে চীন এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শক্তি। দক্ষিণ কোরিয়া এই আলোচনার মাধ্যমে তার সাথে সম্পর্ক জোড়া লাগাবার একটা সুযোগ দেখতে পেল সেটা তারা ছেড়ে দেবে কেন? তারা পিকিং এর প্রস্তাব গ্রহণ করল। এর এক সঙ্গাহের মাথায় তেত্রিশজন চীনা ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মকর্তা সিউল পৌছাল, ছিনতাইকারীদের তাইওয়ানে যাবার আশাও সাথে সাথে ছাড়তে হল, তাদের গন্তব্যস্থল তখন চীনের কেন্দ্রীয় কারাগার।

২.

১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাস, করাচীগামী কুয়েত এয়ারওয়েজের ফাইট ২২১ এর চাকা দুবাই বিমানবন্দরের রানওয়ের পীচ ছাড়ল। চৌদ্দ মিনিটের মাথায় বিমান যখন তার সর্বোচ্চ উচ্চতার কাছাকাছি পৌছে গেছে, ফার্স্ট ক্লাসের বিমানবালার হঠাত নজর আটকাল একটি দৃশ্য, দু'জন যাত্রী মিলে বিমানের নিরাপত্তা কর্মীকে মারাধোর করছে। মুহূর্তকাল পরেই দু'আসনের ফাইট ডেকের কু'রা একটানা দুমাদাম কিছু ফাটার শব্দ শুনতে পেল, পরে তারা বুঝতে পারে ওটা ছিল গুলির শব্দ। হঠাতে কক্ষিপ্রটের দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল, কোপাইলট চমকে উঠে দাঢ়াতে গেলে এক পিস্তলধারী ধাক্কা দিয়ে তাকে আসনে বসিয়ে দিল। দ্বিতীয় জন ক্যাপ্টেন হ্যারি ফ্লার্কের ঘাড়ে হেনেড চেপে ধরে নির্দেশ দিল বিমানের পথ পরিবর্তনের। রানওয়ে ছাড়ার ১৫ মিনিটের মাথায় বিমানের নাক করাচী থেকে ঘুরে গেল তেহরানের দিকে।

তেহরান বিমানবন্দরের আকাশে পৌছলে এক ফ্যাকড়া দেখা দিল, কিছুতেই ছিনতাইকৃত বিমানটিকে অবতরণের অনুমতি দেবে না। ক্যাপ্টেন ফ্লার্ক ১৬১ জন যাত্রী নিয়ে আকাশেই চক্র দিতে দিতে বারবার অনুরোধ করতে লাগল অবতরণের অনুমতির জন্য কিন্তু তেহরান তার সিদ্ধান্তে অটল। নিরপায় ফ্লার্ক এক কৌশলের আশ্রয় নিল। কন্ট্রোল টাওয়ারকে জানানো হল, তাদের কাছে আর মাত্র দশ মিনিট

বিমান নিয়ে কথা

ওড়ার মত জ্বালানী আছে। এ অবস্থায় অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। নামার অনুমতি দিলে ভাল, নাহলে তারা ত্র্যাশাল্যান্ত করতে বাধ্য হবে, তাতে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষেরই ক্ষতি।

ফ্লার্কের কৌশল কাজে লাগল। ইরানের মাটিতে নেমে ছিনতাইকারীরা ১৬১ জন যাত্রীর অধিকাংশকেই মৃত্যি দিল, কিন্তু যারা পেছনে পড়ে রইল, তারা ছিল নরকবাসের জন্য। ১৯৮৩ সালে ইরানে অবস্থিত মার্কিন দুতাবাস ও অন্যান্য লক্ষ্যে বোমা নিষেকের দায়ে ১৭ জন শিয়া মুসলমানকে বন্দী করা হয়। ছিনতাইকারীদের দাবী, এই ১৭ জনকে মৃত্যি দিতে হবে। কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে গিয়ে তাঁরা অবশিষ্ট জিয়াদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু করল। ফার্স্ট ক্লাস আর ইকনমি ক্লাসের মাঝে পর্দা টেনে দেয়া হল, পর্দার ওপারে ফার্স্ট ক্লাস পরবর্তীতে জীবিত যাত্রীদের কাছে পরিণত হল মাদাম তুসো'র চেম্বার অফ হুরুস' এ। বেছে বেছে মার্কিন যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হল সেখানে নির্যাতনের জন্য।

যুক্তরাষ্ট্রের 'আন্তর্জাতিক উন্নয়নের' হিসাব রক্ষক চার্ল্স কাপার বিমানে শেষ পর্যন্ত থাকা সাতজন জিমির অন্যতম। নির্যাতনের ফলে তার চেখের নীচে কালসিটে পড়ে যায়, হাত দু'টো ফুলে ওঠে জুলন্ত সিগারেটের ছ্যাকা খেয়ে। একশ' চল্লিশ ঘন্টার নরকবাস করেছি এই বিমানের ভেতরে, অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে সে বলে, প্রতিদিনই মনে হত আজ আমার জীবনের শেষ দিন, প্রতিদিন ঘুম ভেঙে প্রথমেই মনে হত আজ আমি মারা যাব.....।

কিন্তু নিউইয়র্কের ব্যবসায়ী জন কোস্টা'র অভিজ্ঞতা মনে হয় সবচেয়ে মর্মান্তিক। ছিনতাইকারীরা যাত্রীদের মাঝে দাঁড়িয়ে মার্কিন নাগরিকদেরকে নিজেদের সন্তান করতে বলায় কোস্টা উঠে দাঁড়িয়েছিল। সাথে সাথে তাকে আসনের সারির মাঝখানে এক ধাক্কায় ফেলে দেয়া হল, একজন দুর্বল তার দেহের ওপর লাফাতে লাফাতে শুরু করে দিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে অকথ্য ভাষ্য গালাগালি। কোস্টা বেহুশ হয়ে পড়লে জুলন্ত সিগারেটের ছ্যাকা তার জ্বান ফিরিয়ে আনল। মার্কিন 'এইড' কর্মকর্তা চার্ল্স হেগনা ও উইলিয়াম স্ট্যানফোর্ড মারা পড়ল দুর্বলের গুলিতে। বৃটিশ নাগরিক ক্যাপ্টেন ফ্লার্ককে অবশ্য দৈহিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়নি, পাইলট বিমান চালাতে অক্ষম হয়ে পড়লে নিজেদেরই ক্ষতি ছিনতাইকারীরা তা বুঝতে পেরেছিল। তার পরিবর্তে তাকে সবসময়ের জন্য একটা প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে রেখে দিল তারা। এক পর্যায়ে মেঝেতে দলাপাকিয়ে পড়ে থাকা দু'জন কুয়েতীর মৃতদেহ দেখতে বাধ্য করা হল তাকে। ফ্লার্ক মৃত্যির পর ঐ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলে,

অনুভব করলাম মৃতদেহ দু'টো দেখে আমার শিরদাড়া দিয়ে ঠাণ্ডা কি যেন নেমে গেল। মনে হল, মৃত্যু তাহলে এরকম! আগে কখনও ধারণা ছিল না মানুষের রক্ত দেখতে এরকম টম্যাটো কেচাপের মতো!

ফ্লার্ক এই মৃহূর্তে যা জানত না তা হচ্ছে, 'মৃতদেহ' দু'টোর গায়ে লেগে থাকা আঠালো লালচে পদার্থটি আসলেই টম্যাটো কেচাপ, ছিনতাইকারীরা পিস্তলের ভয় দেখিয়ে

দু'জন কুয়েতীকে বাধ্য করেছিল কোন নড়াচড়া না করে নিষ্পাণ মৃতদেহের মত পড়ে থাকতে। তারপর যাত্রীদের পরিবেশনের জন্য বিমানের খাদ্যভাগেরে রাখা টম্যাটো কেচাপ নিয়ে এসে হটডগের মতো তাদের দু'জনের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছিল।

নির্যাতনে কিছু যাত্রী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল, তাদের অবস্থা দেখে নির্যাতনকারীরা রাজী হল একজন চিকিৎসকে বিমানে প্রবেশ করতে দিতে। তবে তার আগে পাইলট ক্লার্ক এবং মার্কিনী কোষ্টা ও কাপারকে একসাথে শক্ত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলা হল নাইলনের দড়ি দিয়ে, তারপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হল শক্ত কক্ষিপ্রতের মেঝেতে। অবশিষ্ট চার কুয়েতীকেও একইভাবে বেঁধে ফেলে রাখল তারা বিমানের মেঝেতে।

বিমানে প্রবেশ করল একজন ডাক্তার, আহত কুয়েতীদের পরীক্ষা করল, কিন্তু সর্বক্ষণ তার পাহারায় ছিল এক ছিনতাইকারী, ঘেনেড় হাতে। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, ডাক্তার ঝাপিয়ে পড়ল তার ওপর, ছিনিয়ে নিল ঘেনেড়টা তার হাত থেকে। সাথে সাথে দু'জনের মাঝে ধন্তাধন্তি লেগে গেল ঘেনেড়ের অধিকার নিয়ে, শব্দ শুনে দ্বিতীয় ছিনতাইকারী ছুটে এলো প্রথমজনের সাহায্যে। একটা আলোর ঝলকানি, সাথে সাথে বিমানের ভেতরটা ভরে গেল কাঁদানে গ্যাসের দুর্গন্ধে। পরিস্থিতি বুবো ক্লার্ক হাতে বাঁধা দড়িটা টানাটানি শুরু করে দিল, তারা তিনজন পাইলটের আসনের সাথে শক্ত করে বাঁধা। প্রাণপণে দাঁত দিয়ে কামড়ে অবশেষে হাতের বাঁধন খুলতে পারল সে। মার্কিনী দু'জন পরম্পরের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে বাঁধা ছিল, ঐ অবস্থাতেই তারা ছুটতে লাগল ক্লার্কের পিছনে, খোলা দরজার দিকে।

দুর্ভাগ্যবশত ছুটতে গিয়ে কোষ্টা, কাপারের হাতে বাঁধা নাইলনের দড়ি আটকে গেল যাত্রীদের এক আসনের সাথে, হড়মুড় করে পড়ল দু'জনে আসনের ওপরে। দড়িটা ছুটিয়ে নেবার জন্য যখন প্রাণপণে দু'জন টানাটানি করছে, হঠাৎ এক অচেনা লোক খোলা দরজা দিয়ে ছুটে এল ছুরি হাতে ভয়ে আর উজেন্জনায় আধমরা দু'জনকে অবাক করে দিয়ে সে দ্রুত হাতে ছুরি দিয়ে দু'জনের বাঁধা খুলে দিল। প্রকৃতপক্ষে ঐ ছুরি হাতে লোকটি এবং ডাক্তার দু'জনেই ইরানী কমান্ডো বাহিনীর সদস্য, ঐ বাহিনীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল জিম্মীদেরকে বিমান থেকে জীবিতাবস্থায় বের করে আনার। মুক্ত হয়ে কোষ্টা কাপার হড়মুড় করে সিড়ি বেয়ে ছুটল টারম্যাকের দিকে, আহত দুই কুয়েতীকেও উদ্ধার করল ইরানী কমান্ডোরা।

ছিনতাইকারীরা পুরো পরিকল্পনার কোথাও ফাঁক রাখেনি, একমাত্র ডাক্তারবেশে কমান্ডোর প্রবেশ ছাড়া। ক্যাপ্টেন ক্লার্ককে দৈহিকভাবে অক্ষত রেখে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করার কৌশলটা বীতিমত্তে প্রশংসার দাবীদার, কারণ অন্যান্য ছিনতাই এর ঘটনায় এমন বুদ্ধির ছাপ খুব কমই দেখা যায়। একবার তো ছিনতাইকারীরা আত্মপ্রকাশের সময় বিমানের পাইলটকে আহত করে ফেলে, ফলে ক্র্যাশল্যাভিং এর মাধ্যমে পুরো পরিকল্পনা ধ্বনে যায়। এবারে সে ঘটনা।

১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাস, চারদিকে ক্রিসমাস উৎসবের আমেজ। ইরাক ইরান যুদ্ধের বয়স তখন সাড়ে ছয় বছর, প্রত্যক্ষ যুদ্ধের পাশাপাশি পরম্পরকে খোচানোর সুযোগ তারা কখনই ছেড়ে দেয় না। এজন্য বাগদাদ থেকে জর্ডানের রাজধানী আম্মান যাবার পথে ইরাকী এয়ারলাইনের বোয়িং ৭৩৭ এর ৯০ মিনিটের রুটিন ফ্লাইট পরিণত হল দুঃখপ্রণে।

বাগদাদের মাটি ছেড়েছে বিমান তা প্রায় এক ঘণ্টা হল, যাত্রীরা মুরগীর মাংস দিয়ে লাপ্ত প্রায় শেষ করে এনেছে। কেবিনে যাত্রীদের বসার জায়গা থেকে হঠাৎ এক লোক পাগলের মতো চিৎকার করতে হাতে ছুটে গেল কক্ষিপ্রতের দিকে, হেই, হেই, হেই, হেই,..... সাদা পোষাকের নিরাপত্তা কর্মী তা দেখে পাল্টা চিৎকার করে উঠল,

- আরে! থাম, থাম!

কিন্তু ইতোমধ্যে চারজন ছিনতাইকারী আর আধা ডজন ইরাকী নিরাপত্তা কর্মীর মাঝে বেঁধে গেছে হাতাহাতি লড়াই। প্রথম সন্ত্রাসী কক্ষিপ্রতে চুকে পাইলট আর কোগাইলটকে আহত করল বেকায়দাভাবে, তারপর কক্ষিপ্রত আর কোণার একটা কেবিনে ফিট করে দিল জ্যাস্ট ঘেনেড়। এই ধাক্কাধাক্কিতে কিছু ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও গুরুতরভাবে আহত পাইলটের আপোণ চেষ্টায় ১৭ মিনিট ধরে বোয়িংটা তার যাত্রাপথে ছিল। কিন্তু দেহের আঘাতের যন্ত্রণা তীব্র রূপ নেওয়ায় আর শেষরক্ষা করতে পারল না সে, ক্র্যাশল্যাভের সময় বিমান আছড়ে পড়ল রানওয়ের ওপর, বিফোরগে টুকরো টুকরো হয়ে অনেকখানি উড়ে গেল উর্ধ্বাকাশের দিকে। ১০৭ জন যাত্রী ও ক্রু'দের মাঝে তৎক্ষণাত্ম মৃত্যু ঘটল ৬২ জনের, আহত হল ২০ জনের মতো।

দুর্ঘটনার সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ এসে পড়ল ইরানের ওপর। কিন্তু খোমেনী সরকার সাথে সাথেই ঘটনার সাথে তাদের কোন রকম সংশ্রব অঙ্গীকার করল। তবে পরবর্তীতে লেবাননে ইরানপন্থী ইসলামী জিহাদ সহ আরও কয়েকটি সন্ত্রাসী দল বোয়িং ৭৩৭ এর ব্যর্থ ছিনতাই এর দায় স্বীকার করে নেয়।

১৯৭৯ সালে পাকিস্তানের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি জুলফিকার আলী ভুট্টোকে সরিয়ে সামরিক শাসন জারী করল জিয়াউল হক। বিশ্বের বহু রাষ্ট্রের প্রতিবাদ সত্ত্বেও নতুন সামরিক শাসকের নির্দেশে ফাঁসি হয়ে গেল ভুট্টোর। একই সময়ে লন্ডনে জুলফিকার

তনয় মর্তুজা ভুট্টোর নেতৃত্বে গঠিত হল সন্তানী দল, 'আল জুলফিকার', গোড়ায় এর নাম ছিল পাকিস্তান মুক্তিবাহিনী। দলের সাধারণ সম্পাদক মর্তুজা ভুট্টো (২৬) কাবুলে থাকে এবং কাবুল সরকারের উদ্যোগেই সফর করে অন্যান্য আরব দেশসমূহ।

ভুট্টো সমর্থক ছাত্র, সামরিক অফিসার এবং উপসাগরীয় দেশগুলো ও লিবিয়ায় কর্মরত শ্রমিকদের মাঝে ভুট্টো সমর্থকদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল আল জুলফিকার। এই দলের সদস্যদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল বিভিন্ন বিমান ছিনতাই করার। আফগানিস্তানে সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপের পর পাক আফগান সম্পর্কের গুরুতর অবনতি ঘটে, সেখানকার পুতুল সরকার আফগান গেরিলাদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য পাকিস্তান সরকারকে দায়ী করে। জিয়াউল হকের একনায়কতন্ত্রের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মর্তুজা ভুট্টোকে কাবুল সরকার হাতে রাখবে এ আর আশ্চর্য কি?

প্রথম থেকে আল জুলফিকার পাকিস্তানের বিমান সংস্থা পি.আই.এ.কে তাদের বৈধ লক্ষ্য হিসেবে ধরে নেয়। করাচীর হ্যাসারে রাখা একটা ডি.সি.-টেন বিমানে আগুন ধরিয়ে দিয়ে নাশকতামূলক কাজে তাদের হাতেখড়ি হয়। এ পর্যায়ে ভুট্টো পাকিস্তানীদের আহ্বান জানায় পি.আই.এ.তে ভ্রমণ না করার জন্য, পরীক্ষমূলকভাবে আল জুলফিকার যেকোন দিন একটা পি.আই.এ বিমান ছিনতাই করে বসতে পারে। সেসময়ে পাকিস্তানে সামরিক সরকার সকল রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, নির্বাচন পিছিয়ে দেয়া হয়েছে অনিনিষ্টকালের জন্য। বিরোধী দলগুলো আন্দোলনের কর্মসূচী নিয়ে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। ব্যাপক ধরপাকড়ের মাধ্যমে আল জুলফিকার সদস্য, সমর্থক ও বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মীকে জেলে আটক করা হচ্ছে। এসকল ঘটনার প্রতিবাদেই ভুট্টোর একপ হৃষি।

ভুট্টোর হৃষি কাজে পরিণত হতে খুব বেশীদিন লাগল না। ১৯৮১ সালের ২৩ মার্চ পি.আই.এ অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের বোয়িং ৭২০, ১৪৮ জন যাত্রী ও ১১ জন ক্রুসহ পেশোয়ারের উদ্দেশ্যে করাচী বিমানবন্দর ত্যাগ করতেই ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ল। তিনজন পিস্তলধারী পাইলটকে বাধ্য করল আফগানিস্তানের কাবুল বিমানবন্দরের নামতে। তাদের নেতা নিজের পরিচয় দিল মোহাম্মদ আলমগীর হিসেবে। পরবর্তী অনুসন্ধানে অবশ্য তার পরিচয় বের হয়ে আসে সলিমুল্লাহ টিপু হিসেবে। টিপু পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার এক সাবেক কমান্ডো, বিমান ছিনতাইসহ অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতায় তার বিশেষ প্রশিক্ষণ ছিল। পাকিস্তানের বিভিন্ন কারাগারে আটক তার বাবা ও ভাইসহ ৯২ জন বন্দীর মুক্তির দাবি জানান হল জিয়াউল হক সরকারের কাছে, নাহলে সকল যাত্রীসহ তারা বেয়িংটা ধ্রংস করে দেবে।

পাকিস্তান সরকারও হার মানার পাত্র নয়, বড়জোর ১৫/২০ জন, এর বেশি বন্দীকে তারা মুক্তি দিতে পারবে না বলে সাফ জানিয়ে দিল। ছিনতাইকারীদেরকে মানসিক চাপে ফেলতে আর বিরোধী দলকে বিশ্বের চোখে হেয় করার চেষ্টায় তারা অকাজটা 'অধুনালুণ' পিপলস পার্টির বলে রটনা ছড়াল। কিন্তু ফল হল উট্টো, ছিনতাইকারীরা ক্ষেপে গেল সাংঘাতিক। রটনা প্রত্যাহার করতে তারা সরকারকে গুরুতর চাপ দিতে

লাগল। অবশেষে দায়িত্ব স্থাকার করে নিল সরকার, ক্ষমা প্রার্থনা করল প্রকাশ্যে। এতে সন্তুষ্ট ছিনতাইকারীরা মার্চের ৪ তারিখে ১৬ জন মহিলা, ১০ জন শিশু এবং ২ জন পুরুষ বন্দীকে মুক্তি দিল।

কিন্তু প্রথম দফা জিমি মুক্তির পর থেকে কাবুল সরকারের আচরণে বেশ গোলমালের আভাস পাওয়া যেতে লাগল। মুক্ত জিমিদের সাথে তারা পাকিস্তানের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের সাক্ষাতে অবীকৃতি জানাল। উপরত্ব জিমি সংগ্রহে পাকিস্তানের যে বিমানটি কাবুল রওনা হয়েছিল, কাবুল বিমানবন্দরের নামার অনুমতি না পেয়ে বাধ্য হল তা খালি ফিরে আসতে। তানেক কাঠখড় পুড়িয়ে পরদিন পাকিস্তান অনুমতি পেল কাবুল বিমানবন্দর থেকে জিমি সংগ্রহের। জিমি মুক্তি আলোচনার সকল দায়িত্ব কাবুল সরকার তুলে নিল নিজ হাতে, কিন্তু সরাসরি আলোচনায় তারা পাকিস্তান সরকার পক্ষের কাউকে বসতে দিল না। আশ্চর্যজনকভাবে আলোচনার টেবিলে বসল মর্তুজা ভুট্টো, সেখানে আরও উপস্থিত রইল সোভিয়েত প্রতিনিধি। ছিনতাইকারীরা বিমান নিয়ে কাবুল বিমানবন্দরে পৌছালে এই মর্তুজা ভুট্টো তাদের সাথে বুক মেলাল, পাশে দাঁড়ান আফগান সামরিক কর্মকর্তাদের বলল, এরা আমাদের সদস্য এদের প্রথম মিশনই সফল হয়েছে।

আলোচনা চলাকালীন সময় ঘটল দু'টো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, ৫ই মার্চ পাকিস্তানী কুটৈনিতিক জেনারেল রহিম খানের পুত্র আশরাফ খানকে ছিনতাইকারীরা গুলি করে হত্যা করল। পরদিন অর্ধাং ছয় তারিখে ইরানে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসের কর্মচারী তারেক রহিমকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়া হল বিমানের বাইরে। ছিনতাইকারীরা ঘোষণা করল, যদি ৮ তারিখের মধ্যে তাদের দাবি মানা না হয়, তবে জিমিদের একজন একজন করে তারা হত্যা করবে। চরমসীমার কাছাকাছি সময়ে পাকিস্তান সরকার টিপুর বাবা ও ভাইসহ ১৫ জন রাজবন্দীকে মুক্তি দিতে রাজী হল অবশেষে, কিন্তু একই সাথে বিরোধীদলের আরও ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করে বসল। এবার গ্রেপ্তারকৃতদের মাঝে সাবেক রঞ্জিপতির স্ত্রী নুসরাত ভুট্টো এবং কন্যা বেনজীর ভুট্টো রয়েছে।

পাকিস্তান সরকার কাবুল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছিল জিমিদের জীবনরক্ষার জন্য, তারা যেন বিমানটিকে কাবুলেই আটকে রাখে, দরকার হলে বিমানের চাকা ফাটিয়ে দিক। কাবুলের মকোপঝী কারমাল সরকার এ অনুরোধের কোনটিই রাখেনি। ৮ তারিখ বিকেলবেলা দেখা গেল বিমানটা সিরিয়ার দামাকাসের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, পাকিস্তান ত্যাগ করার সময় যে ছিনতাইকারীদের সম্বল ছিল একটা মাত্র পিস্তল ও সামান্য কিছু গ্রেনেড, তারা দামাকাসে পৌছল পিস্তল, টাইমবোমা, বিফোরক ও সাবমেশিনগানে সজ্জিত হয়ে।

বিমানটি দামাকাস পৌছাল কিভাবে, সেও এক রহস্য। কাবুল থেকে সিরিয়া যেতে দু'টো মাত্র আকাশপথ খোলা, ইরান অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর দিয়ে।

বিমান নিয়ে কথা

ছিনতাইকৃত বিমানকে ইরান তার আকাশসীমা ব্যবহার করতে দিতে অঙ্গীকৃতি জানায়, অবশ্য সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ 'ইঁ' 'না' কিছুই বলেনি। সাধারণ যাত্রীবাহী বিমান আকাশসীমা লঙ্ঘন করলে যে সোভিয়েতরা জেনেওনে আকাশেই তা উড়িয়ে দিতে দ্বিধা করে না, সবাই যখন পি.আই.এ বোয়িংটা কোন পথে সিরিয়া গেল তা নিয়ে জন্মনা কল্পনা করছে, তারা তখন একেবারে নিশ্চুপ।

সিরিয়ায় পৌছে বিমানের একজন ত্রু মুক্তি পেল ঠিকই, কিন্তু তার হাতে ধরিয়ে দেয়া হল ৫২ জন রাজবন্দীর এক নতুন তালিকা। পাকিস্তান সরকারকে এবার স্পষ্ট করে বলে দেয়া হল, তালিকার ৫২ জনকে যদি ১২ তারিখের মাঝে মুক্তি দেয়া না হয়, তবে বিমানের ভেতরে যে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড লক্ষে তার দোষের ভাগীদার তাদেরকেও হতে হবে। শেষচেষ্টা হিসাবে ১১ তারিখে ছিনতাইকারীদের রাজবন্দী দুই আঞ্চীয়কে মুক্তি দিয়ে সিরিয়া পাঠিয়ে দেয়া হল জিমি মুক্তির চেষ্টায়, কিন্তু তাদের সাথে ছিনতাইকারীরা দেখা পর্যন্ত করল না।

অবশ্যে চৰমসীমা পার হবার মাত্র মিনিট কয়েক আগে জিয়াউল হক সরকার নতি স্বীকার করল, লিবিয়া প্রথমে মানবিক কারণে বন্দী বিনিময়ের দায়িত্ব নিতে রাজী হল। মার্চের ১৪ তারিখে রাজবন্দী ও ছিনতাইকারীদের আঞ্চীয় ব্রজনকে নিয়ে পি.আই.এ. এর বিশেষ ফ্লাইট যখন আলেপ্পোর আকাশে, হঠাতেই মত পরিবর্তন করল লিবিয়া কোন অঙ্গত কারণে, বিমানটিকে নিষেধ করল সেখানে অবতরণ করতে। বন্দী বিনিময় ও পাকিস্তানী রাজবন্দীদের আশ্রয় দিতেও অঙ্গীকৃতি জানাল সে।

জিয়াউল হক সরকার এবার সতিই বিরাট ঝামেলায় পড়ে গেল, বন্দী বিনিময়ে সৃষ্টি হল অচলবস্থার। কারণ রহস্যময় কোন কারণে ছিনতাই এর আর সকল ব্যাপার কারুল দেখাশোনা করলেও ছিনতাইকারী ও রাজবন্দীদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে সে রাজী হয়নি। বাধ্য হয়েই জিয়াউল হক নিজে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদকে রাজবন্দী বিনিময়ের দায়িত্বটা নিতে অনুরোধ করল। ছিনতাইকারীদেরও এ ব্যবস্থায় কোন আপত্তি দেখা গেল না। ২১১৫ জি.এম.টি. সময়ে ১৪ই মার্চ দামাক্স বিমানবন্দরে ১০২ জন যাত্রীর সাথে ৫২ জন রাজবন্দীর বিনিময় ঘটল, এবং সাথে সাথেই ছিনতাইকারীরা সিরিয়া সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করল। সিরিয়া আগেই বলেছিল সন্ত্রাসীদের তারা রাজনৈতিক আশ্রয় দেবে না, অথচ ১৫ই মার্চ দেখা গেল আল জুলফিকারের সদস্যদের সামরিক গাড়ীতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গোপন আশ্রয়।

পি.আই.এ বোয়িং ৭২০ এর যাত্রীদেরকে মুক্তির পর সৌন্দি বাদশাহৰ নির্দেশে মুক্তি মদীনায় নিয়ে যাওয়া হল ওমরাহ পালনের জন্য। বিমানে যাত্রীদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ছিল ৩ জন মার্কিনী, ১১ জন সুইডিশ, ১১ জন আফগান, ১ জন আলজিরীয়, ১ জন কানাডীয় ও পাকিস্তানী ছাত্র। পাকিস্তানীরা ওমরাহ শেষে স্বদেশে ফিরে এলে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি উপস্থিত থেকে বৃষ্টির মাঝে ফুল ছিটিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানায়।

বিচিত্র কিছু

১.

১৯৮৭ সালের জুনাই মাস, ডেল্টা এয়ারলাইনের জন্য সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে। আর্থিক টানাটানির পাশাপাশি দুঘটনা যেন তাদের পিছু ছাড়তে চাইছে না। এমন পরিস্থিতিতে ঝড়বৃষ্টির মাঝে কেন্টারিক বিমানবন্দরে এসে থামল একটি ডেল্টা বিমান। এই খারাপ আবহাওয়ায় দীর্ঘ যাত্রাশেষে গন্তব্যে নিরাপদে পৌছতে পেরে যাত্রীরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বিমান থেকে নেমে টার্মিনালে ঢুকল তারা হসিমুখে, তবে এই হসিখুশি মেজাজ অনেকেরই থাকল না বেশীক্ষণ, দেখা দিল বিভ্রান্তি। কারণ তাদেরকে স্বাগত জানতে আঞ্চীয় ব্রজন, বন্ধুবাকবের থাকার কথা বিমানবন্দরে, আশ্চর্যজনকভাবে ভিড়ের মাঝে কোন পরিচিত মুখই খুঁজে পাওয়া গেল না।

ঘটনা অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল খারাপ আবহাওয়ার কারণে পাইলট ভুল করে তাদের প্রকৃত গন্তব্যস্থলের পরিবর্তে ভিন্ন এক বিমানবন্দরে নেমে পড়েছে, যা কিনা ১৯ মাইল দূরে অবস্থিত। অগত্যা এ আবহাওয়ার মাঝেই বাসে করে যাত্রীদেরকে তাদের প্রকৃত গন্তব্যস্থল লেক্সিংটনে পৌছে দেয়া হল।

২.

উপরোক্ত ঘটনার ঠিক পরের দিন, ডেল্টা লক্ষ্মি এল ১০১১ বিমান ১৫৩ জন যাত্রীসহ যাচ্ছিল কানাডার ওপর দিয়ে, হঠাতে কন্টিনেন্টাল এয়ারলাইনের বোয়িং ৭৪৭ কোন কারণে তার প্রায় ১০০ ফুটের মধ্যে এসে পড়ে। যাত্রী বোঝাই বিশাল

বিমান নিয়ে কথা

বোয়িং এর জন্য এ দুরত্ব সাংঘাতিক বিপদজনক। বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটতে পারত, সৌভাগ্যক্রমে তা ঘটেনি। তাই বলে ডেল্টা এয়ারের পাইলটকে একেবারে ছেড়ে দেয়া হয়নি, কারণ তার অজ্ঞাতেই বিমানবাহিনীর এক ক্রু ঐ সময়ে দুই বিমানের পাইলটের মাঝে বেতারের আলাপচারিতা রেকর্ড করে রাখে, কেউ জানে না, খবরদার! রিপোর্ট করবে না।

৩.

ডেনভারের স্টেপ্লটন বিমানবন্দর, গত কয়েক দিনের বরফের আন্তরণে ঢাকা। এর মাঝে কন্টিনেন্টাল এয়ারলাইসের এক ডিসি ৯ এসে অবতরণ করল, দ্রুত টার্মিনালের কাছে এসে থেমে গেল তা। এমন খারাপ আবহাওয়ার মাঝে যাত্রী বোৰাই বিশাল এক ডিসি ৯কে সফল অবতরণ করানো বিরাট প্রশংসন্ন দাবিদার।

অবতরণের কয়েক ঘটার মধ্যেই বিমানটির ৪৮ জন যাত্রী, যাদের মাঝে এয়ারলাইস্টির চেয়ারম্যান ফ্র্যাঙ্ক লরেঙ্গেও রয়েছে, আশ্র্য হয়ে গেল 'সফল অবতরণের' রহস্য শুনে। বরফের ওপর আলোর প্রতিফলনে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় জেটের পাইলট ভুল করে ৯০০ ফুট চওড়া একটি ট্যাক্সি চলাচলের পথের ওপর নেমে পড়েছিল। পাশাপাশি অবস্থিত দু'টো রানওয়েকে যুক্ত করেছে ঐ পথ, চওড়ায় তা রানওয়ের ঠিক অর্ধেক। বোৰা যাচ্ছে, নিজের অজ্ঞাতে পাইলট যা ধারণা করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আরও অধিক সফলতার সাথে অবতরণ সম্পন্ন করেছে।

কন্টিনেন্টাল কর্তৃপক্ষ খরচের পরিমাণ কমানোর জন্য নতুন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। এতে পাইলটের বেতন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অনেক কাটছাট করা ছাড়াও প্রস্তাব ছিল দীর্ঘ সময় বিমান চালনার অভিজ্ঞতা ছাড়াই পাইলটদেরকে কাজে নিয়েগ করার। বলা বাহ্য, প্রস্তাবটির অন্যতম উদ্দেশ্য লরেঙ্গো নিজেই। এয়ারলাইনের কর্মরত পাইলটরা প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ধর্মঘট করলে লরেঙ্গো ঐ ফ্লাইটেই যাচ্ছিল তাদের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনায় বসতে। পথিমধ্যে ডেনভারের এ ঘটনা আলোচনা চলাকালীন সময়ে তাকে বেশ বেকায়দায় ফেলে দিল।

৪.

১৯৮৭ সালের ৩০ শে জুন, সিনসিনাতিগামী এক ডেল্টা বিমান যাচ্ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে। পাইলট কাজের ব্যস্ততায় বেখেয়ালে হঠাৎই বিমানের

বিমান নিয়ে কথা

ইঞ্জিনের সুইচ 'অফ' করে দেয়। সাথে সাথে মাঝে আকাশে বিমানের ইঞ্জিন হয়ে গেল বন্ধ, বিমান তৌরের বেগে ধাবিত হল নীচের নীল জলরাশির দিকে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে পাইলট দ্রুত ইঞ্জিন চালু করে দিলেও ততক্ষণে বিমান উচ্চতা হারিয়েছে প্রায় ১,০০০ ফুট। পরে একে সঠিক উচ্চতায় ফিরিয়ে আনতে পাইলটের বেগ বেগ পেতে হয়েছিল।

৫.

বেশিদিন আগের কথা নয়, প্রতিবেশী দেশ ভারতে বেশ অভিনব প্রকৃতির এক বিমান দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার স্থান নয়াদিল্লির ৬৮০ মাইল দক্ষিণে আওরঙ্গবাদ শহর, তারিখ সোমবার, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৯৩ ইং। কন্ট্রোল টাওয়ারের নির্দেশে 'এয়ার ইন্ডিয়া'র বোয়িং ৭৩৭, ফ্লাইট ২০০ যথাসময়ে নিরাপদে টেক অফ করল। টাওয়ারে কর্মরতরা কেউ কেউ তাকিয়ে আছে তার দিকে, বিমানটির নিখুঁত উড়য়ন দেখছে। কিন্তু তাদের তঃপূর্ণ দৃষ্টি অত্যন্ত দ্রুত পরিণত হল অবিশ্বাসে। ঢাকা রানওয়ে ছাড়ার প্রায় সাথে সাথেই বিমানটা আবার তার পেটের ওপর ভর দিয়ে বসে পড়ল মাটিতে। তারপর বিস্কোরণে ভেঙে গেল তিনি টুকরো হয়ে। দাউ দাউ করে জুলে উঠল আগুন।

দুর্ঘটনায় নিহত যাত্রীর সংখ্যা ৫৬ জন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, স্থানীয় পুলিশ ঘটনাটিকে লিপিবদ্ধ করে 'সড়ক দুর্ঘটনা' হিসেবে। কারণ, দুর্ঘটনা ঘটে তখনই, যখন জেটটা রানওয়ের পাশের রাস্তা দিয়ে চলমান কাপড়ের গাত্রিবাহী এক ট্রাকের সাথে ধাক্কা খায়। ট্রাকটা যেহেতু বিমানবন্দরের সীমানার বাইরে রাস্তায় ছিল, সেজন্যই পুলিশ এমন আত্মত রিপোর্ট লিখে। পুলিশ ট্রাক চালককে গ্রেফতার করে এই দুর্ঘটনার অন্যতম হোতা হিসেবে। তাদের ইচ্ছা ছিল বিমানটির পাইলট ও কোপাইলটকেও গ্রেফতার করা, 'আকাশযান্ত্রিক চালক' হিসেবে। অবশ্য তাদের সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি।

৬.

প্রাচ্যের ধনকুবের তেলকৃপের মালিক বিভিন্ন শেখ ও প্রিসদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার নামা কাহিনী আমরা শুনতে পাই। সম্প্রতি তাতে যুক্ত হয়েছে বেশ অভিনব ধরনের একটা ঘটনা। ১৯৯৩ সালের ২৬শে জানুয়ারি, এক সউন্দি প্রিস (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) প্যারিসের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌছলেন। সকাল ১১টায় নিউইয়র্কগামী সুপারসনিক ফ্লাইট ধরার কথা ছিল তাঁর, কিন্তু পথিমধ্যে ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়ে সবকিছু বরবাদ হয়ে গেল। দুঘণ্টা পরে একটা বোয়িং

বিমান নিয়ে কথা

৭৪৭ ছাড়বে ঠিকই, তবে তাতে করে ঘুরপথে নিউইয়র্ক পৌছতে সাড়ে চার ঘণ্টা দেরি হয়ে যাবে। নিউইয়র্কে প্রিসের ব্যক্তিগত ৭৪৭ অপেক্ষা করছে, তিনি সেখানে পৌছলে তাতে চেপে লস্ অ্যাঞ্জেলসে যাবেন। ইতোমধ্যেই তাঁর খানিকটা দেরি হয়ে গেছে, সময় বাঁচাতে প্রিস এয়ার ফ্রাংকের এক বিশাল কনকর্ড বিমান ভাড়া করে ফেললেন যার যাত্রী হবেন তিনি এবং তাঁর ১৯ জন পারিষদ।

কনকর্ড হচ্ছে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মিলিত প্রয়াসে তৈরি সর্বপ্রথম সুপারসনিক যা শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী যাত্রীবাহী বিমান। এর যাত্রীধারণ ক্ষমতা প্রায় দুই শতাধিক। যা'হোক বেলা ১টার সময় বিশেষ ফ্লাইট এ.এফ ৪৯৫৩ এর জন্য প্রস্তুত করা হল এয়ার ফ্রাসের একটি কনকর্ডকে। অন্ন সময়ের নোটিশে ছুটে এল তার ক্যাপ্টেন, যে পোষাকে ছিল সেভাবেই, তাড়াহড়াতে ডিউটিক্যাল ইউনিফর্ম পরারও সময় পায়নি। হাতের কাছে অফ ডিউটিতে ক্রু পাওয়া গেল মাত্র একজন, তাকেই ঠেলেঠুলে চাপিয়ে দেয়া হল বিমানে।

অন্ন সময়ের নোটিশে বিমানটিকে যাত্রার জন্য তৈরি করতে, তাতে জুলানী ভরতে এবং সাথে সম্পূর্ণ বিমানটিকে ভাড়া করতে মোট খরচ পড়ল ১.৩ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক বা দু'লাখ ছত্রিশ হাজার ইউএস ডলার। প্রিস সে খরচ সাথে সাথে মিটিয়ে দিলেন ট্রাভেলার্স চেক কেটে, তারপর সব ঝামেলা শেষে দুপুর দু'টায় রওনা হয়ে গেলেন নিউইয়র্কের পথে, ঐ বিশাল কনকর্ড বিমানে চেপে।